ছেলেবেলার গল্প বিজ্ঞানীদের

সুধাংশু পাত্র

মুখার্জী ব্রাদার্স/কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ

কৃষ্ণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুখার্জী ব্রাদার্স

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ

ধীরেন শাসমল

মুদ্রণে ঃ

প্রিন্টেক্স

কলকাতা-৪

সূচীপত্র



স্বভাব বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্রের ছেলেবেলা

অনেকদিন আগেকার কথা।

তখন বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবাংলা ভাগ হয়নি। আজকে আমরা যাকে বাংলাদেশ বলি, তারই একটি জেলা-ফরিদপুর। ঐ ফরিদপুরের একটি গ্রাম—নাম তার লোনসিং।

গ্রামের শেষে এক জলার ধারে ছিল একটা পোড়ো ভিটে। তিনপুরুষের ভেতরে কেউ দেখেনি কাউকে এখানে বাস করতে। গাঁয়ের লোকে বলতো—পাঁচীর ভিটে। ঝোপঝাড় ও আগাছায় ভরে উঠেছিল, শেয়াল ও বনবেড়ালরা এখানে ওখানে এক একটা আস্তানা গড়ে তুলেছিল, আর গাছের কোটরে কোটরে এবং ঝোপের আড়ালে আড়ালে বাসা বেঁধেছিল যতসব নিশাচর ও দিবাচর পাখী।

রাতের আঁধার ঘণীভূত হলেই কত রকমের কত শব্দ ভেসে আসতো। নাকিসুরে কান্নার মত নিশাচর পাখীদের বিশ্রী আওয়াজ, হুতোমদের ভুক-ভুক ও বনবেড়ালদের ভুস-ভুস শব্দ, মুখে আলো নিয়ে ছুটে যাওয়া খেঁকশেয়ালদের পিলে চমকানো খ্যাক্-খ্যাক্ রব, ছেলে বুড়ো সবার মনে ভীতির সঞ্চার করতো

এবং গাও ছম্‌ছম্‌ করতো সবার। অনেকে আবার আলো জ্বলতেও দেখতো।

গ্রামবাসীদের ধারণা, পোড়ো ভিটে আর ভাঙ্গা ঘর মানেই ভূতের বাসা। তাই সবাই ধরে নিয়েছিল, রাত হলে পাঁচীর ভিটেতে ভূতদের মেলা বসে। গো ভূত, মানুষ ভূত, ঘোড়া ভূত, মেছো ভূত—যত রকমের ভূত আছে সবারই সমাবেশ ঘটে এখানে। সন্ধ্যার পরে সেদিকে কেউ পা বাড়ায় না।

সেবার বর্ষাকালে এক অতি অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন গ্রামবাসীরা। বেশ কয়েকদিন ধরে বর্ষাটা চেপে ধরেছিল যেন। দিনে রাতে সবসময়ই পশলা পশলা বৃষ্টি হচ্ছিল, তার সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখলেন একদিন—পাঁচীর ভিটেতে আলোর ছড়াছড়ি। বেশ ভয় পেলেন তারা এবং যারাই দেখলেন তাঁদের গায়ে কাঁটা দিল।

পরের দিনও দেখলে, তার পরের দিনও। দিনের পর দিন আলোর সংখ্যা বেড়েই চললো। যেদিন রাতে আবার জোরে বৃষ্টি হতো এবং হাওয়া দিতো সেদিন আরও অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড করতো আলোগুলো। কখন একজায়গায় স্থির হয়ে থাকতো, কখন কাঁপতে শুরু করতো, কখন জ্বলতো ও নিভতো, আবার কখনও-বা একাধিক আলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন ছুটোছুটি শুরু করতো। এমন অদ্ভুত দৃশ্য তারা কোনকালে দেখেনি, বাপ-ঠাকুর্দার মুখেও শোনেনি।

গাঁয়ের মানুষের পাঁচীর ভিটেকে ঘিরে যে সব ধারণা গড়ে উঠেছিল, তা আরও দৃঢ় হলো। নিশ্চয়ই এসব অশরীরী প্রেতাত্মাদের কীর্তি। বৃষ্টিবিন্দু পতনের তালে তালে ওরা আনন্দে নাচতে শুরু করে, খেলাধুলায় মেতে উঠে, আক্রোশ প্রকাশ করে, হয়ত বা তাদের সামিল হওয়ার জন্য জীবিতদের আহ্বান জানায়।

সবাই ধরে নিলে, ওরা সহজে নিস্তার দেবে না। অন্ততঃ কিছুসংখ্যক সহচর তারা গাঁয়ের জীবিতদের ভেতর থেকে সংগ্রহ করবেই। তাই সবার মুখই ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো, সবার হাসি গেল মিলিয়ে, শুধু মন্ত্র-তন্ত্র ও তুকতাক। আর দশরথের জ্যৈষ্ঠপুত্রের নাম ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে লাগলো।

সেই গাঁয়ে বাস করতো এক তরুণ। বুদ্ধিতে, বিবেচনায় ও সাহসে বোধ করি তার সমকক্ষ একজনও ছিল না গাঁয়ে। তাছাড়া ছেলেবেলায় বাপকে হারানোর ফলে পুজো-আচচার জন্য রাতবিরেতে যজমানের বাড়ীতে সেই সাত বছর বয়স থেকে ঘুরতে হতো বলে কিছু অতিরিক্ত সাহসও সঞ্চয় করেছিল। পাঁচীর ভিটের আলোককে কেন্দ্র করে গাঁয়ে যখন জোর জল্পনা শুরু হলো তখনই মনে মনে ভাবলে—বর্ষা হলে ভূতের আলো দেখা যায় কেন! ভূতের সঙ্গে বর্ষার তাহলে কী সম্পর্ক? ভূতরা কেমন করেই বা আলো জ্বালায় আর কেনই বা নাচে, ছুটাছুটি করে, ঘুরে বেড়ায়।

যেহেতু রহস্যভেদ করতে এবং দুঃসাহসী অভিযান চালাতে তরুণদের জুড়ি নেই, তাই তরুণটি সংস্কারগুলোকে দূরে সরিয়ে ফেলে আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলো। মনে মনে ঠিক করলে, বর্ষার রাতে একদিন যেতেই হবে ওখানে।

সেদিন সারা আকাশটা কালো মেঘে ঢাকা ছিল। সন্ধ্যার দিকে বেশ ভারি এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। তারপর চললো একটানা ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তরুণটি ভাবলে' আজকে ভূতের আনাগোনা আরও বাড়বে, আরও জোরালো আলো জ্বালাবে। ভূত ধরার এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না কিছুতেই।

রাত একটু বাড়তেই দূর থেকে একবার চক্কর দিয়ে এল সে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল তাই। অদ্ভুত সব আলোর নাচন শুরু হয়ে

গেছে। ছোট-বড়, মিটমিটে-জোরালো নানা ধরণের আলো। নীলাভ দ্যুতি ছড়াতে ছড়াতে আরও ঘনীভূত করেছে রহস্যকে।

তরুণটি ছুটে গেল বন্ধুদের কাছে। তাদের একজায়গায় জড় করে বললে—পাঁচীর ভিটেতে আজ আলোর ছড়াছড়ি। একসঙ্গে সবাই যাই চল, দেখা যাক কেমন ভূতের আলো, আর ভূতরাই বা কেমন?

বন্ধুদের অনেকেই অ্যাঁৎকে উঠল। দু-একজন বললে—এযে ভূতের আলো এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কী দরকার ওদের চটাতে গিয়ে? রাত হলে তারা খেলা করে, ঘুরে বেড়ায়, আমাদের তো কোন ক্ষতি করে না! ওদের বিরক্ত করলে নির্ঘাৎ গাঁয়ের বিপদ হবে।

তরুণটি বললে—আমার মনে হচ্ছে, এ ভূতের আলো নয়। এর মধ্যে কিছু না কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে।

দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালে অনেকে। বললে—না, ভূত ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না। আর সহস্য ভেদ করতে গিয়ে ভূতের ফাঁদে পা দেওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তরুণটির জেদ যেন চেপে বসলো এবার। মনে যতটুকু সংস্কার কিংবা ভয় ছিল, সবটুকুকে একরকম জোর করে দূরে সরিয়ে ফেললো যেন। দৃঢ় কণ্ঠে বললো—তোমাদের মুখে তো খুব আস্ফালন শুনি! দিনের বেলায় তুড়িদিয়ে ভূতকে উড়িয়ে দিতেও দেখেছি। কাজের বেলায় ভয় কেন? ভূতরা কেমন ছুটে এসে গলাটিপে মেরে ফেলে আমাদের এতজনকে—একবার দেখা ই যাক না!

কারওই সাহস হলো না। তখন তরুণটি বললো—তোমরা থাকবে পেছনে, আর আমি থাকবো সবার সামনে। দূরত্ব বাঁচিয়ে চলো; যদি সত্যি ভূত তাড়া করে তাহলে প্রথম ঝাপটাটা যাবে আমার উপরে তখন বেগতিক দেখলে পালিয়ে এসো তোমরা।

এবার সম্মত হলো মাত্র দুটি বন্ধু। তরুণটি বললো—আমরা তিনজন হলেই চলবে। চলো এবার, লণ্ঠন হাতে এবং ছাতি মাথায় পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই!

নিশুতি রাত। টিপটিপ করে পড়ছে বৃষ্টি, রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত। এ পথে সাপের ভয়, বিষাক্ত পোকামাকড়ের ভয়, পিছলে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গারও ভয়। তবু সব ভয়কে উপেক্ষা করে তিন বন্ধু তিনটি ছাতি মাথায় এবং তিনটি লণ্ঠন হাতে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। সবার আগে সেই তরুণ এবং পেছনে পেছনে বন্ধু দুটি। কিন্তু পথ যেন ফুরোয় না, প্রতিটি মুহূর্ত প্রহর বলেই মনে হতে লাগলো।

একসময় আলোর কাছাকাছি হলো তারা। কিন্তু একী! যত কাছাকাছি হলো, ততই যেন উদ্দামগতিতে জ্বলতে শুরু করলো আলো। মাঝে মাঝে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছুটতেও আরম্ভ করলো বলে মনেও হলো। তখন একটি বন্ধু "ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লেরে" বলে পেছন ফিরে সোজা বাড়ীর দিকে ছুটে পালালো। অপর বন্ধুটি যেন কলাপাতার মত কাঁপতে শুরু করলো থর থর করে। সেও পালাবে কিনা ভাবছে, এমন সময় তরুণটি খপ করে তার হাতটা ধরে প্রবলভাবে একটা নাড়া দিলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলো—তুমিও পালিয়ে যাবে নাকি? অর্ধজড়িত স্বরে বন্ধুটি বললো—এ আলো, সত্যিই ভূতের আলো। আর এগিয়ে কাজ নেই ভাই, পালিয়ে চলো।

তরুণটির মনেও যে ভয় ধরেনি এমন নয়। অজানা আশঙ্কায় বুকটা তার দুরু দুরু করে কাঁপতে শুরু করেছে ততক্ষণে। তবুও ভূতকে দেখা এবং ভূতের রহস্য উদ্ঘাটন করার নেশা তাকে যেন পাগল করে ছাড়লো। তাছাড়া এতদূর এসে কাপুরুষের মত পালিয়ে যাবে সে!

তরুণটি মনে মনে ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর বন্ধুকে বললো—মরতে যখন একদিন হবে তখন মরার ভয় করে লাভটা কী! এতদূরে যখন এসে পড়েছি, তখন আর একটু এগিয়ে যাইনা কেন? কত আলোর খেলা ওরা দেখতে পারে—দেখাই যাক্!

বন্ধুটি বললো—না, আমি আর একটি পাও নড়ছি না। যেতে হয় তুমি একা যাও, আর আমি এইখান থেকেই কেটে পড়লাম।

বন্ধুকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখে তরুণটি মনে মনে আরও চিন্তা করলো। শেষে বললো—তুমি যদি নিতান্ত না যেতে চাও, তাহলে একটা কাজ কর!

—কী কাজ? জিজ্ঞাসা করলো বন্ধুটি।

—তুমি পালিয়ে না গিয়ে এইখানেই বসে থাকো আর জোরে জোরে রাম নাম কর। জানোতো, রাম নাম করলে ভূত আসে না!

বন্ধুটি এবার যেন বল পেলো। জিজ্ঞাসা করলো—এখানে বসে বসে আমায় কী করতে হবে?

তরুণটি বললো—তোমাকে কিচ্ছুটি করতে হবে না। শুধু বসে রামনাম করবে, আর আমি যখন ডাকবো তখন সাড়া দেবে।

বন্ধুটি আঁৎকে উঠলো। চোখ দুটো কপালে তুলে বললো—সব্বনাশ! নিশুতি রাতে ওরা অনেক সময় নাম ধরে ডাকে। তোমার বদলে ওরা যদি তোমার গলার স্বর নকল করে ডাকে তাহলে কী হবে আমার—ভেবে দেখেছো কী?

তরুণটি এবার মহা ফাঁপরে পড়লো। বললো—ঠিক আছে! আমি তোমার নাম ধরে ডাকবো, কথা বলবো, আর তুমি মুখে চিৎকার করে রাম রাম বলবে। এবার হয়েছে তো?

এবার সম্মত হলো বন্ধুটি। বললো—এ আমি বেশ পারবো।

রামনামের অক্ষয় কবচ ধারণ করে পথের মাঝে একটা উঁচু

জায়গা দেখে বসে পড়লো বন্ধুটি, আর একা তরুণ আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলো। একটা বাঁক পথ ঘুরতেই তরুণটি অবাক না হয়ে পারলো না। আলোটা একেবারে যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। একটা বিরাট অংশ জুড়ে আলোটা ছড়িয়ে আছে এবং মনে হলো যেন একটিই আলো—শ্মশানের চিতার মত। কিন্তু আলো লাল রঙের নয়—তীব্র এক নীলাভ দ্যুতি।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো তরুণ। ভাবলো, কেন দূর থেকে আলোর এমন সব উদ্ভট খেলা দেখা গিয়েছিল? এখন কেন খেলা বন্ধ করলে? নাকি মানুষের সাড়া পেয়ে সবগুলো একত্রিত হয়ে আক্রোশে ফুঁসছে? ঐ ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ন আলোক রশ্মি দিয়ে তাকে কী আঘাত করতে চাইছে?

হঠাৎ ঝিরঝিরে একটা দমকা হাওয়া বহে গেল পাশে কচুগাছের মাথার উপর দিয়ে। এবার কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠলো তরুণের চোখের সামনে। এতক্ষণে বুঝতে পারলো, আলোটাকে আড়াল করে রেখেছে জলার ধারে বিরাট বিরাট জল কচুর গাছ-গুলো। ওদের বড় বড় পাতাগুলো আন্দোলিত হতে শুরু করলেই আলোটাকে একবার আড়াল করে এবং আরবার সরে যায়। ফলে দূর থেকে অনেকগুলো আলো যেমন দেখা যায় তেমনই আলোগুলো খেলা করছে বলেও মনে হয়। কিন্তু পোড়ো ভিটেতে এ কিসের আলো?

সাহসে বুক বেঁধে একটু একটু করে এগিয়ে গেল তরুণ। সেই একই সন্দেহ—এ কী ভূতের আলো না অন্য কিছু? অশরীরী কোন কবন্ধের ঘাড় থেকে কী নির্গত হচ্ছে এই আলোক রশ্মি? চিৎকার করে বন্ধুকে জানিয়ে দিলো—আমি এগিয়ে চলেছি। আমার মনে হচ্ছে, এ ভূতের আলো নয়। সাহস হারাবে না কিন্তু!

তারস্বরে রামনাম উচ্চারণের ভেতর দিয়ে জবাব দিলো বন্ধু।

আর তখনই আরও খানিকটা এগিয়ে গেলো তরুণ এবং একটু পরেই পা দিলো পাঁচীর ভিটেয়। পায়ে পায়ে আলোটার কাছে গিয়ে দেখলে, সে এক তাজ্জব ব্যাপার। বহুদিন আগে কেটে ফেলা বিরাট এক তেঁতুলগাছের কাটা অংশের সমস্তটা জুড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আলো। মাটি থেকে মাত্র হাতখানেকের মধ্যে। লণ্ঠনটা তুলে এবার ভাল করে গুঁড়িটার দিকে তাকালো তরুণ।

কতক্ষণ কেটে গেল। তরুণটি এবার বাম হাতকে ঠেকালো সেই আলোর গায়ে। একেবারে নিরুত্তাপ সে আলো। গুঁড়ির গায়ে আঙ্গুল ঘষতেই পচাকাঠ ঝরে পড়লো এবং যেইখানে ঝরে পড়লো সেইখানেই দেখা গেল নীল নীল আলোর দ্যুতি। আঙ্গুলেও প্রকাশ পেলো আলোর আভা—জোনাকিকে আঙ্গুলে পিষে মারলে যেমনটি হয়।

এবার একটা বড় ধরণের টুকরা ভেঙ্গে এনে খুব ভালভাবে দেখলো তরুণ। এতক্ষণে বুঝতে পারলো, পচা কাঠের উপর গজিয়েছে এক ধরণের ছত্রাক—সেই ছত্রাকই বাদলা দিনের রাতে বিতরণ করে আলো। অথচ দিনের বেলায় ওদের কোন বৈশিষ্ট্যই ধরা পড়ে না। বর্ষাকালে পচা বাঁশের উপর, কাঠের উপর যাদের গজিয়ে উঠতে দেখা যায় তাদের সঙ্গে অনেক মিল। তবে কেউ তারা আলো বিতরণ করতে পারে না—এই মাত্র তফাৎ। বেশ কয়েকখানা ছত্রাক সমেত কাঠকে খসিয়ে এনে এবং কচু পাতার মোড়কে পুরে মৃদুমন্দগতিতে তরুণটি ফিরে এলো বন্ধুর কাছে। বললো—ভূতের আড্ডা দেখে ফিরে এলাম বন্ধু! তবে ভূত হয়ে নয়, একেবারে সশরীরে।

বন্ধুর মুখ থেকে যেন আপনিই নির্গত হলো—তুমি সত্যি গিয়েছিলে?

মধুর হাসি হেসে তরুণটি বললো—শুধু যাওয়া নয়, কিছু ভূতকে পাকড়াও করে এনেছি। দেখতে চাও ?

যেন আকাশ থেকে পড়লো বন্ধুটি। বললো—তার মানে ?

কচুপাতর মোড়কটা খুলে লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দিয়ে একটু আড়াল করে ধরলো। দপ দপ করে উঠলো নীল আলো। বন্ধুটি এবার নিজ হাতেই তুলে নিলো একটাকে। তারপর নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হলো।

এই দুঃসাহসী এবং সংস্কারমুক্ত তরুণটির নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—যিনি শুধু গোপাল ভট্টাচার্য নামে অধিক পরিচিত। সেদিন সেই ছত্রাককে সংগ্রহ করে তৃপ্তি লাভ করেননি। বাড়ীতে এসে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও চালিয়েছিলেন। কয়েকটা টুকরাকে জলের তলায় ডুবিয়ে রেখেছিলেন, কয়েকটাকে শুধু জলে ভিজিয়ে, বাদবাকীকে শুকিয়ে ফেলেছিলেন। দেখেছিলেন, জল পেলেই ছত্রাকের ভেতরের আলো প্রকাশ পায়।

এর পরের ঘটনা বলার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। গ্রামবাসীদের ভীতি দূর করায় তিনি যে রাতারাতি সবার প্রিয় হতে পেরেছিলেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সেই থেকে একটা খেয়াল চেপে বসেছিল তাঁকে ঐ ছত্রাকটাকে চিনে নিয়ে তিনি রাত-বিরেতে ঘুরতে শুরু করলেন, অন্য কোন গাছ কিংবা ছত্রাক আলো দিতে পারে কিনা—দেখার জন্য।

জীবজন্তু-কীটপতঙ্গের দেহের কোন কোন অংশ থেকে এই জাতীয় হালকা নীলাভ দ্যুতিসম্পন্ন আলো যে নির্গত হয়—তা তিনি জানতেন। সে আলোর উত্তাপ নেই এবং অন্ধকারকেও পারে না ছিন্ন ভিন্ন করতে। আকাশের ঐ মিটমিটে তারাদের মত রাত্রিকালে ঝোপঝাড়ের মাথাগুলো ভরে ওঠে জোনাকির আলোতে। ঘরের চালায় বেড়ালের চোখ দুটোকে অন্ধকারে

জ্বলতে দেখে কতবার শিউরে উঠতে হয়েছে, খানাখন্দে ও জলাভূমিতে আলেয়ার আলো চোখে পড়েছে বহুবার, নীল নীল আলোর রেখা ছড়াতে দেখা গেছে বিছেদেরও। কিন্তু গাছের বা ছত্রাকের আলো এই প্রথম দেখেছিলেন গোপালচন্দ্র। তাই আবিষ্কারের নেশা যেন পেয়ে বসেছিল তাঁকে। ছেলেবেলার সেই অভিজ্ঞতা পরের দিকে অনেক কাজে লেগেছিল এবং বিখ্যাত ছত্রাক বিজ্ঞানী সহায়রাম বসুকে সাহায্য করেছিল অনেকখানি। আর পরিণত বয়সে অলোকদায়ী উদ্ভিদ সম্বন্ধে লিখতেই বহু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি পড়েছিল তাঁর উপর এবং তিনিও বিজ্ঞানীর মর্যাদালাভ করেছিলেন।

গোপালচন্দ্রের ছেলেবেলাটা বড় বিচিত্র। তাঁর বাল্যজীবন অপর দশটা সাধারণ ছেলের মত সহজ সরল পথে অগ্রসর হতে পারেনি। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে গোপালচন্দ্রের বাবা মারা যান। আর তিনিই ছিলেন বাপ মায়ের বড় ছেলে। জমি জায়গা ছিল না, আর ছিলনা কোন সঞ্চয়। থাকার মধ্যে ছিল কয়েকঘর যজমান। মায়ের অল্প লেখাপড়া জানা থাকায় সেই পাঁচ বছর বয়সেই মায়ের কাছে বসে পুজোপদ্ধতির মন্ত্র শিখতে হয়েছিল এবং যজমানের বাড়ীতে ছোট ছোট পুজো করতে হতো।

বালক গোপালচন্দ্রের স্মৃতিশক্তিও ছিল বেশ প্রখর। যা একবার শুনতেন—তা যেন চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে যেতো মনে। দুপুরের দিকে মায়ের কাছে রামায়ণ ও মহাভারত শুনতেন। পরের দিকে অর্থাৎ কিশোর বয়সে মায়ের মুখে শোনা কাহিনীগুলিকে নাটকে রূপ দিয়েছিলেন। তখন রামায়ণ মহাভারত পড়ার আর প্রয়োজন হয়নি। বেজায় শান্ত ও চুপচাপও থাকতেন তিনি।

গোপালচন্দ্রের মধ্যে বিরল যে গুণটি ছেলেবেলায় প্রকাশ পেয়েছিল—সেটি তার প্রকৃতি প্রেম। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও।

প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজতে সেই বয়সেই হয়ে উঠেছিলেন উন্মুখ। ঘুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন পরিবেশের জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ ও গাছপালাদের। নতুন কোন জীব বা উদ্ভিদ তাঁর চোখে পড়লেই সহসা দৃষ্টি ফেরাতে পারতেন না। পশুপাখী ও কীটপতঙ্গদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনাও তাঁকে পেয়ে বসেছিল। অতি ক্ষুদ্র যে পিঁপড়ে, তাদের পিলপিল করে ছুটে যাওয়ার ছন্দ তাঁকে মোহিত করতো। পিঁপড়েদের ঘর বাঁধা, মাকড়সার জাল বোনা, ঝিঁ ঝিঁ পোকার চিৎকার ও চেঁচামেচি দেখতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে। পোকামাকড়দের এবং পাখীদের চিৎকার শুনে তাদের মনের ভাব বুঝতে চেষ্টা করতেন, পাটগাছের ডগায় থুথুর মত জিনিস দেখে তার ভেতরের পোকাকে সনাক্ত করতে চেষ্টা করতেন, ভোমরা ও মৌমাছির গুনগুন শব্দ শুনে মোহিত হয়ে যেতেন. আর ছুটতেন প্রজাপতি ও ফড়িংদের পেছু পেছু।

গোপালচন্দ্রের চেষ্টাও ছিল খাঁটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মত। অতি তুচ্ছ এবং অতি ক্ষুদ্র কোন কিছুও বাল্যবয়সে তাঁর চোখকে ফাঁকি দিতে পারতো না। আর যখনই নতুন কোন কিছুকে দেখতেন, তখনই সব কিছু ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। তারজন্য অনেক সময় অসুবিধায়ও পড়তে হতো তাঁকে।

গোপালচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র বারো বছরের মত। গাঁয়ের হাইস্কুলে সবে ভর্তি হয়েছেন। দশটায় স্কুলে যাওয়ার আগে রোজ রোজ কয়েকটা বাড়ীতে পুজো করতে হয়। পুজো শেষে সোজা ইস্কুল, তারপর টিফিন পড়লে বাড়ীতে এসে খাওয়া।

সেদিন যজমানের বাড়ীতে একটু বেশী কাজ ছিল। তাই একটু সকাল সকাল গামছা কাঁধে গোপাল চন্দ্র গেলেন বাড়ী থেকে কিছুদূরে একটা পুকুরে স্নান করতে।

গ্রাম্য সরু গলিপথ। পথের দুধারে গাছপালা ঝোপঝাড়। হন

হন করে হাঁটছেন গোপালচন্দ্র, হঠাৎ "থুপ" করে কী একটা ক্ষীণ শব্দ হলো যেন। গোপালচন্দ্র দাঁড়িয়ে পড়ে চারদিকে চোখ ফেরালেন একবার। দেখলেন, একটু দূরে বেড়ার পাশে জেলির মত কী একটা জিনিস পড়ে আছে। সেইটিই ঝোপের ডগা থেকে পড়ে গেছে মাটিতে।

গোপালচন্দ্র উবু হয়ে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করলেন। একটা কাঠি নিয়ে ওটাকে নাড়াচাড়া করবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় সেই জেলির মত জিনিসটা যেন আপনা হতেই নড়ে উঠলো একবার। খুব মজা পেলেন বালক গোপাল। স্নানের কথা, যজমানের কথা, ইস্কুলের কথা, সবই গেলেন ভুলে আর তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন জেলিটাকে।

কতক্ষণ পরে জেলিটা ধীরে ধীরে লম্বা হতে শুরু করলো। তারপর একসময় দুভাগে ভাগ হয়ে একটু একটু করে গড়িয়ে চললো।

এবার আরও মজা পেলেন গোপাল। শেষপর্যন্ত কী হয়—দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন। আর কী আশ্চর্য! দুটি টুকরাই দূরে দূরে অবস্থান করে পূর্বের মত লম্বা হতে শুরু করলো এবং পূর্বের মতই দু-দুটো টুকরায় ভাগ হয়ে গেলো। অবশেষে এরাও অবিকৃত রইলো না। ভাগ হতে হতে অনেকগুলো টুকরা হয়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে পথ পার হয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলেন—এটি এক ধরণের জীব।

সেদিন যজমানের বাড়ীতে তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল আর ইকুলেও যাওয়া হয়নি। কিন্তু এই আশ্চর্য ব্যাপারটি তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল যেন। সেই বয়সে তো বটেই, পরিণত বয়সেও ওকে খুঁজেছিলেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার চোখে পড়েনি। কৌতূহল মেটাতে গিয়ে বহু বইও পড়েছিলেন তিনি। অনেক—অনেকদিন পরে একটি বইতে পড়েন এই ধরণের এক পদার্থকে—যা জীব ও উদ্ভিদের মাঝামাঝি।

বড় অনুসন্ধিৎসু মন ছিল বালক গোপালচন্দ্রের। ঐ অনুসন্ধিৎসার জন্য ঘরের আনাচে কানাচে ঘুরতেন পিঁপড়ে ও ভোমরাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য, পুকুরের ধারে ধারে ঘুরতেন নানা ধরণের জলপোকা ও মাকড়সাদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য, বনেবাদাড়ে ঘুরেছেন শুঁড়াপোকা ও ঝুঁড়িপোকার গুটি বানানো দেখতে। কতবার কত মৌমাছি ও বোলতার দংশন যে খেয়েছেন, কতবার যে সাপখোপ ও বিষাক্ত পোকার সান্নিধ্যে এসে জীবন বিপন্ন করেছেন, কতবার যে কত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

গোপালচন্দ্রের এই স্বভাব জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও বিদ্যমান ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও ভুলতে পারেননি পোকামাকড় ও জীবজন্তুদের। তাই গবেষণাগারে পালন করতেন পিঁপড়ে, মৌমাছি ও ব্যাঙদের। পরিণত বয়সে ওদের কাজ কারবার দেখলেও স্থান কাল পাত্র ভুলে গিয়ে এবং কাজ কামাই করে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। অর্থাৎ এটি ছিল তাঁর সহজাত গুণ।

প্রথম কলিকাতায় বসুবিজ্ঞান মন্দিরে কাজ করার সময় একদিন এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। পথ হাঁটার সময় হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, পথের পাশের একটা বাড়ীর রাস্তার দিকে জানালায় একটা মাকড়সা জাল বুনছে। অমনি কী খেয়াল হল তাঁর! দাঁড়িয়ে পড়লেন মাকড়সাটার জাল বোনা দেখতে এবং কিছুটা সরেও গেলেন জানালার দিকে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বাড়ীর মালিক তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন। ভাবলেন, লোকটা হয় চোর নয়ত নিতান্ত নির্লজ্জ ও অভদ্র। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জানালার ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখে নিচ্ছে।

ছুটে এলেন মালিক। তারপর শুরু করে দিলেন বচসা। গোপালচন্দ্র আত্মপক্ষ সমর্থন করে মাকড়সার কথা বলতেই চটে

উঠলেন এবং গলাধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে চললেন পুলিশের হাতে দেওয়ার জন্য। সৌভাগ্যক্রমে পথে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলেন গোপালচন্দ্র।

অতি ছোটবেলাতেই গোপালচন্দ্র তাঁর কোমল ও উদার মনের পরিচয় রেখেছিলেন। যে বয়সে ছেলেরা মায়ের কোল ছাড়া হতে চায় না সেই বয়সেই মাও নিতান্ত ছোট ভাই দুটিকে প্রতিপালন করতে জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরিচিত-অপরিচিত যে কেউ বিপদে পড়লে সেই বয়সেই তিনি ছুটে যেতেন সবার আগে এবং সাধ্যমত সাহায্যও করতেন। এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও কোন সংস্কারের বশীভূত হননি। মানতেন না জাতিভেদ প্রথা, ছোট জাতের মানুষের সঙ্গে এন্তার ঘুরে বেড়াতেন আর মানতেন না ব্রাহ্মণদের আচার।

অভাবের তাড়নায় পড়াশোনাও বেশীদূর করতে পারেননি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু অর্থাভাবে শেষ পরীক্ষা দিতে পারেননি। আর এই-খানেই তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ পড়েছিল। সেই কিশোর বয়সে অর্থ-উপার্জনের পথ যেমন দেখেছিলেন, তেমনই সমাজে যারা নিপীড়িত ও অবহেলিত তাদের জন্য কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করেছিলেন।

সেই বাল্যকালেই গোপালচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন, সমাজের অস্পৃশ্যেরা পুরুষাণুক্রমে মার খাচ্ছে শিক্ষা-দীক্ষা না থাকার জন্য। তারা একদিকে যেমন নিজেদের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা করে না, অপরদিকে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে তাদের সেই দুর্বিসহ জীবনকে আঁকড়ে রাখে। তাঁর আরও ধারণা হয়েছিল, কিছু লেখাপড়া শিখতে পারলে ওরা সচেতন হতে পারবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে এবং অদৃষ্টের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসটা দূরীভূত হবে। তাই

পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর গোপালচন্দ্র কিশোর বয়সে কোমর বেঁধে লেগেছিলেন অস্পৃশ্যদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে। স্থাপন করেছিলেন একটি সংস্থা—নাম "কমল কুটীর।"

সংস্থাটিতে আরও কয়েকজন তরুণকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন গোপালচন্দ্র। নিচ জাতের ছেলেরা—যারা সমাজের উপেক্ষিত, পড়াশোনার কোন সুযোগ পায় না, তাদেরই তিনি পড়াতেন কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ না করেই। বয়স্করা যাতে অবসর সময়ে কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করতে পারে তার জন্য নানা ধরণের হাতের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

তরুণ গোপালচন্দ্রের আবেগপ্রবণ মন ঐখানে থেমে যায়নি। সমাজের নিম্ন-শ্রেণীর মানুষদের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর মানুষের ঘৃণা যাতে দূরীভূত হয় তার জন্য হাতে লেখা একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই পত্রিকাকে বিনি পয়সায় বিলিয়ে দিতেন।

গোপালচন্দ্র শুধু স্বভাব বিজ্ঞানী নন, স্বভাব কবিও ছিলেন। সেই সময় তিনি বহু গান রচনা করেছিলেন এবং খাড়া করেছিলেন একটি কবিগানের দল। সুকণ্ঠ ছিলেন এবং সঙ্গীতেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ফলে কবিয়াল সেজে এখানে ওখানে গান গাইতেন। সে গান ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের প্রতি উচ্চশ্রেণীর মানুষের অবিচার।

এর ফল কিন্তু ভাল হয়নি। তাঁর এই ক্রিয়াকলাপে গাঁয়ের উচ্চবর্গের মানুষেরা একেবারে ক্ষেপে উঠেছিলেন এবং গ্রাম থেকে বিতাড়িত করার আয়োজনও করেছিলেন। কিছুকালের মধ্যে অতি কষ্টে যোগাড় করা গাঁয়ের স্কুলের চাকরিও চলে যায়। এবং গ্রাম পরিত্যাগ করে কলিকাতায় আসতে বাধ্য হন। এর ফল অবশ্য ভালই হয়েছিল বলতে হবে। কারণ, গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞানী হওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল। যেন অভিশাপ আশীর্বাদ-রূপে দেখা দিয়েছিল তাঁর জীবনে।

গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞানে কোন ডিগ্রী ছিল না। কেবলমাত্র প্রকৃতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস এবং কীট-পতঙ্গদের প্রতি গভীর মমত্ববোধই তাঁকে বিজ্ঞানী করে গড়ে তুলেছিল। পরিণত বয়সে তিনি গবেষণাও করেছিলেন ঐ কীট-পতঙ্গ ও আলোকদায়ী উদ্ভিদদের নিয়ে। উদ্ঘাটনও করেছিলেন বহু তথ্য—যাদের অনেকগুলিই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞানের ডিগ্রী ব্যতীত পৃথিবীতে যারা বিজ্ঞানী আখ্যা লাভ করেছেন, সেই মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে গোপালচন্দ্র একজন। এঁর প্রতিভার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা হয় ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রকৃতি বিজ্ঞানী ফ্যাবারের—যাঁর বাল্য ও যৌবন অতিবাহিত হয়েছিল গোপালচন্দ্রের মত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে।



ঋষি প্রফুল্লচন্দ্রের ছেলেবেলা

এক ছিল দুরন্ত ছেলে। নাম তার ফুনু। মা ভাবলেন, ফুনু পাঠশালায় গেলেই দুরন্তপনা ছাড়বে। তাই একটু সকাল সকাল পাঠালেন পাঠশালায়।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়ে আরও দুরন্ত হয়ে উঠলো। আর পড়াশোনার প্রতি মনও বসলো না। যে কোন ছুতো করে পালিয়ে আসতো পাঠশালা ছেড়ে আর গাছে উঠে চুপচাপ বসে থাকতো। কখনও বা বন্ধুদের নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো, খেলা করতো, নয়ত আড্ডা দিতো।

বড়লোকের ছেলে। রোজ রোজ পাঠশালা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া—গুরুমশাই প্রমাদ গুণলেন। প্রথমে ধমক দিয়ে এবং পরে শাসন করে বালকটিকে বাগে আনতে চেষ্টা করলেন। পড়াশোনায় যাতে মন বসাতে পারে তার জন্যও চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। কিন্তু হায়! গুরুমশাইর সব চেষ্টাই নিষ্ফল হলো।

বাধ্য হয়ে গুরুমশাইকে এবার বালকের পিতার শরণাপন্ন হতে হলো। বললেন—আপনার ছেলে ফুনু পড়াশোনায় বেজায় অমনোযোগী। বকুনি দিলে কাজ হয় না, শাসনও মানে না।

রোজ রোজ পালিয়ে যায় পাঠশালা ছেড়ে। গাছে চড়া, পাখীর বাচ্চা চুরি করা, দুষ্টু ছেলেদের দিয়ে দল পাকানো—এই তার কাজ।

বাবা হাসলেন। বললেন—ছেলের কাজ ছেলেরাই করে। এর জন্য চিন্তা করবেন না পন্ডিতমশাই।

এমন একজন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মুখে আপন ছেলে সম্বন্ধে এমন মন্তব্য আশা করেননি গুরুমশাই। গম্ভীর হয়ে বললেন—এ স্বভাব থেকে গেলে ভবিষ্যতে যে পড়াশোনা আদৌ করতে পারবে না!

বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন—তার জন্য চিন্তা কী? সবে তো পাঁচ বছর বয়স। একটু বড় হোক, বই-র চাপ পড়ুক, দেখবেন আপনিই ঠিক হয়ে গেছে। এ বয়সে একটু দুষ্টুমী করুক না!

—কিন্তু ঐ ছোট ঘরের দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মাখামাখি, দলপাকানো, এর বেলায়? বাবা অত্যন্ত ধীর ও শান্ত স্বরে বললেন—সব বাড়ীর সব ছেলেইতো দুষ্টু। আজ থেকে ঐ ছোট্ট শিশুর মনে ছোট-বড়র প্রভেদটা নাইবা জাগালেন পন্ডিতমশাই! সবার সঙ্গে সমানভাবে বেড়ে উঠুক, সবার সঙ্গে পরিচিত হোক, সবার সুখ-দুঃখ বুঝুক, তবেই না প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। আত্মকেন্দ্রিক মন নিয়ে কে কবে বড় হয়েছে বলুন?

মাত্র বছর তিন-চারেক পরে বাবার ধারণাই ঠিক হলো। পড়া নিয়ে একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠলে ফুনু। কোথায় গেল দুরন্তপনা আর কোথায় গেল দলপাকানো! পড়া, পড়া, আর পড়া। যে কোন বই দেখলেই সামনে পেতে বসে থাকে, এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ দেখলেও লেখাটুকু পড়ে নিতে চেষ্টা করে। এমনকি সেই দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়াকালেই রাত জেগে বই পড়তে শুরু করলে।

বাবা কিন্তু এত পড়াশোনা করাটাকে পছন্দ করলেন না। ছেলেমানুষ। পড়ার সময় পড়বে, খেলার সময় খেলা করবে, ঘুমানোর সময় ঘুমাবে. তার বদলে সব সময় বইতে মুখ গুঁজে বসে থাকা! স্বাস্থ্য টিকবে কেমন করে? একদিন বাবা ডাকলেন ছেলেটিকে। বললেন—সব সময় বই নিয়ে বসে থাকাটা ভাল নয়।

—কেন বাবা? জিজ্ঞাসা করলে বালক।

বাবা বললেন—পড়ার যেমন দরকার আছে, তেমনই শরীরটাকে ঠিক রাখারও আছে প্রয়োজন। শরীর চর্চা না করে শুধু বই পড়লে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে যে!

—আমাকে তাহলে কী করতে হবে?

—পড়াশোনা, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো, সবই নিয়ম মত করতে হবে। এদের কোনটিকে বাদ দেওয়া চলে না।

বালক বললে—বই দেখলে যে পড়তে ইচ্ছে করে!

বাবা বললেন—এতো খুব ভাল কথা। তবে দু-দিনের বদলে দশ দিন ধরে পড়বি!

বাবার কথায় সম্মত হলো বালক।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষানুরাগী। সে সময় ভারতবর্ষে বিভিন্ন শহরগুলিতে পাশ্চাত্যের অনুকরণে শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু তার ঢেউ গ্রামে-গঞ্জে এসে পেঁছোয়নি। বাবা ভাবলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হতে না পারলে ছেলেরা প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না। তাই সুদূর কলিকাতায় গিয়ে একটা বাড়ী ভাড়া করলেন এবং ছেলেদের সেইখানে রেখেই পড়াতে শুরু করলেন।

সবার সঙ্গে ফুনুও এলো কলিকাতায়। তার বয়স তখন এগার বছরও পূর্ণ হয়নি। বাবা তাকে হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন।

কলিকাতায় আসতে ফুনুর সেই আগের নেশাটা আবার চেপে

বসলে। আবার শুরু করলে বই পড়া। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুলের পাঠ তৈরির পরই বসে যেতো বাইরের কোন না কোন বই নিয়ে। গল্প বই, অন্য শ্রেণীর যে কোন পাঠ্য পুস্তক, এমনকি গণিতের বইও বাদ পড়তো না। তার জন্য খুব ভোর ভোর উঠে পড়তো এবং আলো জ্বেলে শুরু করতো পড়তে।

বাবা এবারও সাবধান করে দিলেন। বললেন—এত পড়া ভাল নয়। নিয়ম মাফিক পড়বি, ইস্কুলে যাবি, খাবি আর ঘুমাবি।

বালক ফুনু বাবার কথা রাখতে চেষ্টা করে। দু-চার দিন কমিয়ে দেয় পড়াশোনা এবং রাতজাগা, তারপর আবার সেই আগের মত। প্রায় একবছর এইভাবে চলার পর বাবার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো। ফুনুকে আক্রমণ করলো কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে। তখন সে পড়তো চতুর্থ শ্রেণীতে।

পিতা চিকিৎসার ত্রুটি করলেন না। একটু আরোগ্য লাভ করতেই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ফুনুকে বাবা নিয়ে এলেন গ্রামের বাড়ীতে। সাময়িকভাবে পড়াশোনা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো। বাড়ীতে যাতে বই নিয়ে আদৌ বসতে না পারে তারজন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন বাবা এবং এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করেছিলেন বালকের স্বাস্থ্যটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার জন্য।

গাঁয়ে এসেও এক অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকলো বালক। বেজায় দুর্বল, হাড়ের কাঠামোর উপর যেন একটা চামড়ার আস্তরণ। এখানকার চিকিৎসকও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দিলেন পড়াশোনা।

বালক আর কী করে ? খায় দায় আর ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সময় যেন কাটতে চায় না তার। সবসময় কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। চারদিকে এমন কড়া পাহারা যে, হাতের কাছে একখানাও বই পাওয়ার উপায় নেই। একটু কিছু পড়তে গেলেই —হাঁ হাঁ রব উঠে। একেবারে যেন ম্রিয়মান হয়ে উঠলে বালক।

বাবারও কিন্তু পুস্তক পাঠের নেশা ছিল প্রবল। প্রতিদিন অন্ততঃ কিছু সময় পুস্তকপাঠে ব্যয় করতেন। ঐ কারণে তিনি গড়ে তুলেছিলেন নিজস্ব একটি ছোট্ট পাঠাগার। যখনই নতুন নতুন বই পেতেন তখনই কিনে আনতেন এবং তাঁর পাঠাগারটিকে সমৃদ্ধ করতেন। অনেক সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঠাগারে বসে সময়ও কাটাতেন

বাবা ছিলেন জমিদারও। তাই বাহিরের প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো। বহুজনে আসতোও তাঁর কাছে। অপরদিকে প্রজাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করতেন তিনি। ফলে বাড়ীতে থাকলে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটতো লোকজনদের সঙ্গে। আর রাতে পাঠাগারে ঢুকতেন এবং কিছু সময় নিরিবিলিতে পুস্তকপাঠে ব্যয় করতেন। পাঠাগারকে বন্ধ রাখার বিশেষ প্রয়োজনও মনে করতেন না তিনি। এমন কি ফুনুর কথা ভেবেও না। কারণ, ফুনু মাত্র চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এত শক্ত বই পড়তে ফুনু কিছুতেই সমর্থ হবে না।

একদিন মনে মনে বই-র খোঁজ করতে গিয়ে ফুনু দেখলে, বাবার পাঠাগার খোলা অবস্থায়ই আছে। দরজাটা শুধু ভেজানো কিন্তু তালা বন্ধ নয়। মনটা তার আনন্দে নেচে উঠলো যেন। এদিকে ওদিকে বার কয়েক তাকিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়লো ঘরে আর দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিলে।

বালক এতদিনে যেন স্বস্তি পেলে। একেবারে নিরিবিলি, কেউ দেখতে পাবে না, বাবাও দিনের বেলায় ঢুকবেন না এখানে। যতক্ষণ খুশি বসে বসে এই পড়া যাবে। কী মজা, কী মজা!

দিনের পর দিন চলতে লাগলো বই পড়া। প্রতিদিন সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বাবা বেরিয়ে গেলেই পাঠাগারে

ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দেয়। আর বাবার আসার সময় হলে, অথবা কেউ খোঁজ করলে চুপচাপ ভাল মানুষের মত বেরিয়ে আসে।

কথায় বলে চোর সবদিন চুরি করলেও একদিন না একদিন ধরা পড়ে। ফুনুর বেলায়ও তাই হলো। একদিন বাবাই তাকে ধরে ফেললেন হাতে নাতে। জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী করিছিলি ওখানে।

ফুনু মুখটা কাচুমাচু করে বললে—বইগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখছিলাম।

বাবা ছেলের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তুই ওসব বই পড়তে পারিস!

ফুনু মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

বিস্মিত বাবা পুনরায় প্রশ্ন করলেন—পড়ে বুঝতে পারিস ?

সলজ্জভাবে উত্তর দিল ফুনু—হ্যাঁ।

বাবার বিস্ময় আরও বেড়ে গেল। একটু পরীক্ষা করারও কেমন যেন ইচ্ছে হলো তাঁর। জিজ্ঞাসা করলেন—তুই এখন কোন বই খানা পড়ছিলি শুনি ?

বালক বললে—কালিদাসের যুগ।

—বইটা কে লিখেছেন বলতো ?

—রামদাস সেন।

বাবার বইটা ভালভাবেই পড়া ছিল। তিনি বেশ কয়েকটা প্রশ্ন তুলে ধরলেন বালকের সামনে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বালক সব প্রশ্নেরই নির্ভুল উত্তর দিলে। অবাক হয়ে বাবা তাকিয়ে রইলেন ফুনুর মুখের দিকে।

কিছুক্ষণ পরে বিস্ময়ের ঘোরটা একটু কাটতে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী রোজ রোজ এখানে বসে বসে বই পড়িস ?

বালক মাটির দিকে তাকিয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত নীরবে

দাঁড়িয়ে রইলে। বাবা বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করলেন—আর কী কী বই পড়েছিস!

মৃদুস্বরে বললে বালক—বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" আর প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাল্মীকি ও তাঁহার যুগ"।

বাবা আদর করে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—এখন আর পড়িসনে ফুনু! শরীরটা সেরে উঠুক, একটু বড় হ'। দেখবি. কত বই এনে দেবো তোকে।

এই ফুনু আর কেউ নন, বিজ্ঞানে দীন ভারতবাসীর বুকে যিনি আশার সঞ্চার করেছিলেন যাঁর দুশ্চর তপশ্চর্যার প্রভাবে ভারতে বিজ্ঞান আলোচনার জোয়ার এসেছিল এবং যিনি ভারতকে বিশ্বের দ্বারে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রথম মন্ত্রপাঠ করেছিলেন—সেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিশেষ করে বাংলার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য তাঁর মত এত বেশী ভাবনা আর কেউ করেননি বলা চলে। জীবনের শেষদিন পর্যন্তও তরুণদের উৎসাহিত করে গেছেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন।

আচার্যের বাল্যজীবন ও ছাত্রজীবন খুব সুখের ছিল না। শৈশবে রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় যে স্বাস্থ্যকে হারিয়ে ছিলেন, সেটি পুনরুদ্ধার হয়নি। বাবা বৈষয়িক ছিলেন না বলে, কলিকাতায় ছেলেদের পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে এবং সাধারণ মানুষের অভাব মোচন করতে গিয়ে শেষের দিকে একে একে জমিদারীগুলো বিক্রয় করতে করতে চরম আর্থিক কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাই পরের দিকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রফুল্লচন্দ্রকে লেখাপড়া করতে হয়েছিল।

প্রফুল্লচন্দ্র ছেলেবেলায় পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা বাহিরের বই-ই বেশী পড়তেন। কথিত আছে, দু-বছর পড়াশোনা বন্ধ রেখে গাঁয়ে কাটাবার পর তিনি পুনরায় কলিকাতা গিয়েছিলেন এবং ভর্তি হয়েছিলেন আলবার্ট স্কুলে। স্কুল আরম্ভ হওয়ার অনেক আগেই

হাজির হতেন স্কুলে। তাড়াতাড়ি স্কুলে যাওয়ার একমাত্র কারণ ছিল, প্রতিদিনের ইংরেজী ও বাংলা খবরের কাগজগুলি পড়া।

পড়াশোনার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ সত্ত্বেও একমাত্র ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারেননি। অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে এফ, এ, ও প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করার পর বিলাত যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেন। অবশ্য বিলেতে পাঠানোর ইচ্ছেটা বাবারই ছিল। কিন্তু ততদিনে তাঁর অবস্থা চরমে উঠেছে। বিলেতে রেখে খরচ বহন করার মত সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। অপরদিকে প্রফুল্লচন্দ্রের বি, এ, পরীক্ষার নম্বরই হতাশ করেছিল তাঁকে। তাই উদাসীন রইলেন। আর বাবার ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে কিশোর প্রফুল্লচন্দ্র নিজেই সচেষ্ট হলেন।

সে সময় ভারতীয় ছাত্রদের বিলাতে থেকে বিনা খরচে পড়াশোনার জন্য একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হতো। প্রফুল্লচন্দ্র ভাবলেন, ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করা যাবে এবং তাতেই সম্ভব হবে বিলাতে পড়াশোনা করা।

প্রফুল্লচন্দ্র এবার উঠে পড়ে লাগলেন। রাতদিন ডুবে রইলেন বইর মধ্যে। স্বাস্থ্যটা আরও খারাপ হলো সত্যি. কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। লাভ করলেন বৃত্তিটি। এবং সুযোগ করে নিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি পড়ার।

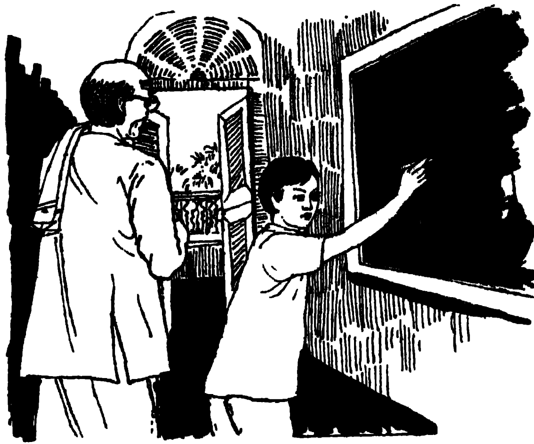
বিলাত থেকে ডি. এস. সি উপাধি নিয়ে ফিরে আসার পর অল্প বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়নের সহকারী অধ্যাপকরূপে কাজ শুরু করেন। পরে অধ্যাপকের পদ লাভ করলে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

ভগ্নস্বাস্থ্য হলেও প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। সবসময় ব্যাপৃত থাকতেন গবেষণায়। মারকিউরাস নাইট্রাইট নামক পারদের

একটি যৌগ আবিষ্কার করে তিনি রসায়ন বিজ্ঞানে স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছেন। তবে ভারতবর্ষের বিজ্ঞানে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান মনে হয় একদল বিজ্ঞানীকে তৈরী করা। পরবর্তীকালে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সব বিজ্ঞানী আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন, তাঁদের সবাইকে নিজ হাতে গড়েছিলেন আচার্যদেব।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা বাল্যকাল থেকে গড়ে উঠেছিল। পল্লীর গাছপালা, মাঠঘাট, নদীনালা প্রভৃতি শৈশবে তাঁর মনে যে প্রভাব ফেলেছিল—তাকে তিনি কোনদিনই বিস্মৃত হতে পারেননি। সুযোগ এলেই ছুটে যেতেন পল্লীর বুকে এবং নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন যেন। হয়ত এই প্রকৃতি প্রেমই তাঁকে বিজ্ঞানীতে রূপান্তরিত করেছিল।

সাধারণ মানুষকে তিনি ভালবাসতেন নিবিড়ভাবে। এই ভালবাসাই তাঁকে সমাজসেবায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আর এটিও তিনি লাভ করেছিলেন সেই বাল্যকালে এবং কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করাও বটে। সেদিনের সেই দুরন্ত ছেলে ফুনু পাড়াময় ঘুরে বেড়াতো, দল পাকাতো, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে পরিচিত হতো। আর সেদিন পরিচিত হতে পেরেছিলেন বলেই উত্তরকালে দেশবরেণ্য সমাজসেবী রূপে পূজিত হয়েছিলেন।



অঙ্ক যাদুকর শ্রীনিবাস রামানুজনের ছেলেবেলা

এমন শান্ত ও সরল ছেলে কেউ কখনও দেখেনি! দুষ্টুমি কাকে বলে জানতো না। ঘরে চুপচাপ বসে থাকতো, কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করতো না, মারপিটও না। বরং শান্ত পেয়ে অন্যান্য ছেলেরা মারধোর করতো। কিন্তু বালকটি কারও বিরুদ্ধে নালিশ করতেও জানতোনা।

পাঠশালায় পড়তে যেতো বালক। কেমন যেন বোকা বোকা ভাব। চুপচাপ বসে থাকতো আর-অঙ্ক কষতো। অঙ্ক শেখার পরে কেমন যেন অঙ্ক কষায় বাতিক ধরেছে তাকে। কেবল নিজের বইর অঙ্ক নয়, সেই বয়সে অন্যান্য শ্রেণীর অঙ্ক বইর অঙ্কগুলোও কষে ফেলতে পারতো। অঙ্ক কষতেই আনন্দ পেতো, নতুন অঙ্ক দেখলে উৎফুল্ল হয়ে উঠতো, বইর পদ্ধতি ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে অঙ্ক কষতে ভারি মজা পেতো। এক কথায় অঙ্কই ছিল তার ধ্যান, জ্ঞান আর আরাধনা।

বালকের কৌতূহলও ছিল বেজায়। রাতে আকাশের তারা-গুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো—গুণতি করতেও চেষ্টা করতো! পরিবেশের গাছপালা ও জীবজন্তু তার মনকে কেড়ে

নিতো, আকাশের চাঁদ-সূর্যকে দেখে বিস্মিত হতো। আর পাঠশালায় এসে মাষ্টার মশাইর সামনে তুলে ধরতো ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন। প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত হতেন মা-বাবাও।

সহপাঠীরা কিন্তু বুঝে নিয়েছিল, পড়াশোনার বুদ্ধিতে—বিশেষ করে অঙ্ক কষায় এর জুড়ি কেউ নয়। অথচ কেমন যেন গোবেচারা গোছের। তাই-অবাকও হতো এবং তামাসা করতেও এগিয়ে আসতো।

সহপাঠীরা রোজ রোজ খোঁজ করতো কোথায় কত কঠিন অঙ্ক পাওয়া যায়। দু-চার খানা এমন কঠিন অঙ্ক এনে বালকের সামনে ধরতো। বলতো "এ অঙ্কগুলো আমরা কষতে পারছি না, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখনা ভাই!"

বালক অত্যন্ত আনন্দ সহকারে বসে যেতো অঙ্ককে নিয়ে। কঠিন অঙ্কতো। তাই বালককে ভাবনা চিন্তা করতে হতো অনেক। সে কী চিন্তা! যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে চিন্তা সাগরে ডুব দিতো, কিংবা এমন এক রাজ্যে বিচরণ করতো—যার হদিস সে নিজেই খুঁজে পেত না।

ঠিক এই অবস্থার জন্য অপেক্ষা করতো সহপাঠীরা। তারাতো আর সত্যি অঙ্ক কষার জন্য দেয়নি। তাই করতো কী! মাথার উপর কোলের উপর রাজ্যের যত বাজে নোংরা জিনিস, কাগজের টুকরো; পাথরের টুকরো একের পর এক রেখে দিতো। কখনও মুখে ও মাথায় কালিঝুলিও মাখিয়ে দিতো। কিংবা চুলে দড়ি বেঁধে টিকির মত ঝুলিয়ে দিতো। আর হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়তো।

একসময় অঙ্ক কষা শেষ হতো বালকের। যেন সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে তাকাতো সহপাঠীদের দিকে। পূর্ণিমার চাঁদের মত, বর্ষার ভরা নদীর মত, বসন্তের ফুলে ফুলে ভরে ওঠা বাগানের মত হাসিতে হাসিতে ভরে উঠতো মুখমন্ডল। কিন্তু উঠে দাঁড়ালেই

ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তো মাটির ঢ্যালা এবং পাথরের টুকরোগুলো। অমনি বালকের মুখে নেমে আসতো আঁধার আর সহপাঠীদের মধ্যে পড়ে যেতো হাসির রোল। বালক কিছুই বুঝতে পারতো না, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো, অবশেষে সেও বোকার মত যোগ দিতো তাদের হাসিতে।

কখনও কখনও কালিঝুলি মাখা অবস্থায় কিম্ভূতকিমাকার মুখ নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হতো। তাকে দেখে রাস্তার ছেলেরাও পর্যন্ত হাসাহাসি করতো। ঠাট্টা বিদ্রূপও করতো কেউ কেউ। ওদের হাসির কারণ বুঝতে না পেরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়তো। কখনওবা আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে আসতো বাড়ীতে।

ছেলের মূর্তি দেখে মা বড় ব্যথা অনুভব করতেন। আর ছেলেকে নিতান্ত বোকা ভেবে দুঃখও করতেন। বালকের মুখ থেকে কালি তুলে ফেলতে গিয়ে অভিযোগ করতেন স্থানীয় জাগ্রতা দেবী নার্মাগিরির কাছে। বলতেন—মাগো, পুত্রহীনাকে পুত্র দেওয়ার জন্য তোর কাছে কত মানত করলুম, কত ধর্না দিলুম, কত পূজা দিলুম। শেষে কিনা একটা হাবাগোবাকে পাঠিয়ে দিলি মা ?

ছেলের দিকে তাকিয়ে বলতেন—হ্যাঁরে, তুই এত বোকা কেনরে! ছেলেরা তোর মুখে কালি মাখিয়ে দেয় আর তুই অমনি মুখটা পেতে ধরিস ?

বালক বলে—কই, কখন তারা কালি মাখিয়ে দেয়? আমিতো জানিনা? মা অবাক হন। বলেন—সে কী রে? রোজ রোজ তোর মুখে তাহলে কালি লাগে কেমন করে ?

বালক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে। কোন উত্তর দিতে পারেনা সে।

বালক একটু বড় হয়। এবার যে শুধু অঙ্কই কষে না। অঙ্ক সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন রাখে শিক্ষকদের কাছে। প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত

হন শিক্ষকরা। অনেক সময় অত্যন্ত ভেবে চিন্তে উত্তর দিতে হতো অঙ্কের শিক্ষক মশাইকে।

অষ্টম শ্রেণীতে তখন অধ্যয়ন করে বালক। সেদিন মাষ্টার-মশাই ক্লাসে বোঝাচ্ছিলেন, কোন সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়া ভাগ করলে ভাগফল এক হয়। বালক তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলে—শূন্যটাওতো একটা সংখ্যা? মাষ্টার মশাই বললেন—হ্যাঁ, তা তো বটেই।

বালক এবার জিজ্ঞাসা করলে—তাহলে শূন্যকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কী ভাগফল "এক" হবে?

মাষ্টার মশাই এবার সত্যিই মুস্কিলে পড়ে গেলেন। ব্যাপারটা ঠিক ঠিক তাঁর জানা ছিল না। তাই প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু বালক ছাড়বার পাত্র নয়। তার মনে কোন প্রশ্ন উদয় হলে সে সমাধান না করে কিছুতেই স্বস্তি পেতো না। তাই পুনর্বার তুলে ধরলে সেই প্রশ্নটি।

মাষ্টার মশাই তখন বাধ্য হয়ে এবং বিস্তর চিন্তা করে বললেন—আইনতঃ তাই হওয়ার কথা।

বালক যখন নবম শ্রেণীতে পড়তে আরম্ভ করে তখন তার অঙ্কের নেশা আরও প্রবল হয়ে উঠলো। রাতদিন ঘরে বসে শুধু অংক কষতেই শুরু করলে। স্কুলের অপরাপর ক্লাসের সে অঙ্ক কষে শেষ করে ফেলেছে ততদিনে। সব অংকই তার জানা হয়ে গেছে। নতুন নতুন অংক বইর জন্য এবার সে পাগল হয়ে উঠলো যেন।

একদিন এক বি. এ. পাঠরত ছাত্রের কাছে দেখলে একটা নতুন ধরণের অংক বই। জিজ্ঞাসা করে জানলে এটি ত্রিকোনোমিতির বই। বালক যদিও কোনদিন ত্রিকোনোমিতির নাম শুনেনি, তবুও অংকগুলো দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। চেয়ে নিয়ে এল বইটাকে।

পরের দিন মাষ্টার মশাই অঙ্কের খাতা দেখে অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি ওসব কী হিজিবিজি অঙ্ক করেছো খাতায়।

বালক মুখটা কাচুমাচু করে জবাব দিলে—ত্রিকোনোমিতির অঙ্ক।

বালকের অঙ্কের প্রতিভা জানতেন মাষ্টার মশাই। কিন্তু নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের কাছে ত্রিকোনোমিতি আশা করেননি। জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাকে ত্রিকোনোমিতির অঙ্ক কেউ শেখাচ্ছে বুঝি?

বালক বললে—আজ্ঞে না, আমি নিজে করেছি।

বালকটির কথা মাষ্টার মশাই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর ধারণা হলো, বালক মিথ্যে কথাই বলছে। মনে মনে একটু ক্রুদ্ধ হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কারও সাহায্য না নিয়েই তুমি ত্রিকোনামিতির অঙ্ক কষলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বইর কষা অঙ্কগুলো দেখে দেখেই অঙ্ক করা শিখে ফেলেছি। ডাহা মিথ্যে কথা ভেবে মাষ্টার মশাই আরও ক্রুদ্ধ হলেন। রাগে গরগর করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন—এতগুলো অঙ্ক তুমি একাই কষে ফেলেছো?

—হ্যাঁ সবই।

এর মধ্যে যে কোন অঙ্ক তুমি কষে দেখাতে পারবে?

—পারবো!

মাষ্টার মশাই কথা না বাড়িয়ে খুব কঠিন দেখে একখানা অঙ্ক বোর্ডে লিখে দিলেন। বললেন—অঙ্কটা কষে দাও দেখি!

বালক কোনরকম ইতস্ততঃ না করেই বোর্ডের কাছে উঠে গেল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে অঙ্কটি কষে দিলে।

মাষ্টার মশাই রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। এমন বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী কেউ কখনও হয়েছে বলেও তাঁর মনে হলো না। জ্ঞানের গঙ্গোত্রী ধারাকে সামনে দেখে চমকে উঠলেন যেন।

স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য পুরস্কৃত করা

হয়েছিল বালককে। এই শিক্ষক মহাশয় সেদিন বালকটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, এই বালককে অংকে ১০০ এর মধ্যে ১০০ নম্বর দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারিনি। ওর অংকের প্রতিভা নম্বরের সাহায্যে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

এই অসামান্য প্রতিভাধর ছেলেটিই শ্রীনিবাস রামানুজন। অতি অল্প বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন, তথাপি অংকের ক্ষেত্রে রেখে গেছেন সুচিরস্থায়ী অবদান। অংক সম্বন্ধে তাঁর প্রচণ্ড জ্ঞান ছিল তাই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন অংক যাদুকর নামে।

এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রামানুজন। বাবার পড়াবার সামর্থ্য ছিল না। এক কাপড়ের দোকানে হিসেব নিকেষের কাজ করে যে সামান্য বেতন পেতেন তাতেই কোনরকমে সংসার চালাতে হতো পিতাকে। শুধু অসাধারণ প্রতিভাই বালকের বিশ্বশিক্ষার পথকে কিছুটা সুগম করেছিল। তবু উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারেননি।

রামানুজনের বয়স যখন মাত্র ৬ বছর তখনই তাঁর মধ্যে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছিল। অনেক অংক তিনি মুখে মুখে কষে ফেলতে পারতেন। তবে পাঠশালার গুরুমশাই এর জন্য কোন গুরুত্ব আরোপ করতেন না বা ক্লাসের ছেলেরাও না। বরং কৌতুকই অনুভব করতেন সবাই।

প্রাথমিক পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন রামানুজন। ঐ কারণেই তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে অর্ধ বেতনে পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তানাহলে ঐখানেই তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেতো। ষোলবছর বয়সে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়।

অতঃপর কলেজে এফ, এ, ক্লাসেও ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ঐ সময় তিনি অংককে নিয়ে প্রচণ্ডভাবে মেতে উঠেন।

কথিত আছে, কলেজ লাইব্রেরীর অঙ্কের উপর লেখা উচ্চ ক্লাসের বইগুলি দেখে তিনি প্রলুব্ধ হন এবং কলেজ থেকে বই আনিয়ে শুরু করেন অঙ্ক কষতে।

নিত্য নতুন অঙ্ক, অঙ্কের যেন শেষ নেই। আবার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর অজস্র অঙ্ক বই। একটি বছর কেমন করে যে কেটে গেল—বুঝতে পারলেন না রামানুজন। বার্ষিক পরীক্ষায় দেখা গেল, অঙ্কে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ ই পেয়েছেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে ফেল করে বসে আছেন। ফলে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারলেন না আর বৃত্তিটিও তাঁর কাটা গেল।

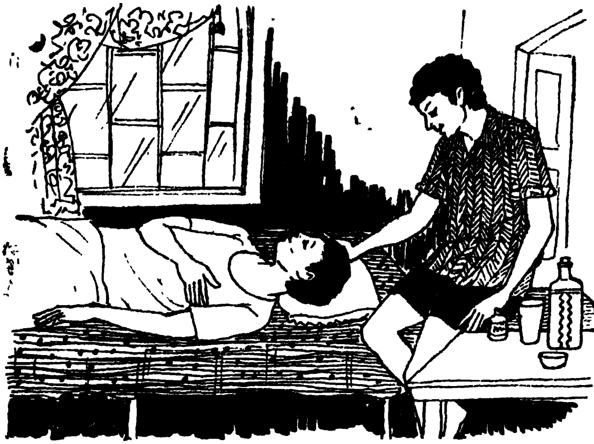
রামানুজন খুব বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এক বেসরকারী কলেজে ভর্তি হয়ে পুনরায় শুরু করলেন পড়াশোনা। কিন্তু কয়েক মাস পরে অসুস্থ হয়ে পড়েলেন। শেষ পরীক্ষা আর দেওয়া হলো না। পরে প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরূপে এফ. এ. পরীক্ষায় বসলেন। কিন্তু ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, অঙ্কে ১০০ র মধ্যে ১০০ ই পেয়েছেন, আর অন্যান্য বিষয়ে পাশ নম্বর পাননি। এফ, এ, পরীক্ষায় আর পাশ করা হলো না তাঁর।

রামানুজন আর পড়াশোনার জন্য চেষ্টা করেননি। শুরু করলেন চাকরি খুঁজতে। অভাবের সংসারে কিছু অর্থ উপার্জন না করলে নয়। অনেক কষ্টে জোটালেন একটি কেরাণীর কাজ —বেতন ত্রিশটাকা। রামানুজন এবার যেন কতকটা স্বস্তি পেলেন। কেরাণীগিরির ফাঁকে ফাঁকে শুরু করেছিলেন অঙ্কচর্চা। একসময় যেন পাগল হয়ে উঠলেন অঙ্ককে নিয়ে। সারারাত ধরে চলতো অঙ্ক কষা।

দিনের পর দিন রাত জাগা এবং চুপচাপ বসে থাকাকে মাও সরল মনে গ্রহণ করতে পারেননি। বুঝিবা তাঁর মনে হয়েছিল, ছেলেটা পাগল অথবা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। হাসেন না, খেলাধুলা করেন না, বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হল্লা করেন না,—এ আবার

কেমন ধরণের ছেলে ? মা তাই ছেলের মতিগতিকে ফেরাবার জন্য একটু সকাল সকাল বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু এতটুকু পরিবর্তন হয়নি। যেই পাগল—সেই পাগলই ছিলেন চিরকাল।

রামানুজন যে পাগল নন, এটির আবিষ্কারক এক বিদেশী গণিতজ্ঞ ফ্রানসিস স্প্রীং। এক এফ, এ, ফেল ছেলের অঙ্কের গবেষণাবলী দেখে হতবাক হয়ে যান এবং নিজে বুঝতে না পেরে পাঠিয়ে দেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হার্ডির কাছে। হার্ডিই বুঝতে পারেন এই অনন্য সাধারণ প্রতিভাকে এবং আহ্বান জানান কেম্ব্রিজে গবেষণার জন্য। এই হার্ডিই একদিন বলেছিলেন "আমি রামানুজনকে যা শিখিয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশী শিখেছি তার কাছ থেকে।"



অত্যাশ্চর্য্য ডাক্তার সুব্বারাও-এর ছেলেবেলা

পিঠোপিঠি দুই ভাই। দুজনের ভেতরে বেজায় ভাব। একসঙ্গে নাওয়া, একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে স্কুলে যাওয়া, এক সঙ্গে ঘুমানো—একজন ছাড়া অপরজনের চলে না কিছুতেই। যমজ দুটি ভাইর মত, মেঘের সঙ্গে হাওয়ার মত, সূর্যরশ্মির বর্ণগুলোর মত গায়ে গায়ে লেগে থাকে যেন।

সেবার বড় ভাইকে ধরলো রোগে। বাবার অবস্থা ভাল নয়। কেরাণীগিরি করে কোনও রকমে সংসার চালিয়ে থাকেন। তথাপি চিকিৎসার কোন ত্রুটি করলেন না। রোগ কিন্তু সারলো না, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। বাবা উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত ডেকে আনলেন শহরের এক নামকরা চিকিৎসককে।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন চিকিৎসাশাস্ত্র আজকের মত এত উন্নত ছিল না। বহু রোগ ছিল দুরারোগ্য। অর্থাৎ সেসব রোগে আক্রান্ত হলে রোগী বাঁচতো না। স্প্রু ছিল সেই ধরণের এক রোগ এবং এই রোগের শিকার হতো যত তরুণরা।

চিকিৎসক এসে রোগীকে ভালভাবে দেখলেন, তারপর একসময় মুখ ভার করে উঠে গেলেন। বাবাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন

—আপনার ছেলের স্প্রু হয়েছে। এর কোন প্রতিষেধক আজও আবিষ্কৃত হয়নি। আমি তাই নিরুপায়।

ভাইটিও দাঁড়িয়ে ছিল কাছে। বুঝিবা ডাক্তারের মতামত শোনার জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করছিল। শোনা মাত্রই বুকটা তার ভেঙ্গে যেন খান খান হয়ে যেতে চাইলো চোখ ফেটে নামলো জলের ধারা, আর হাত-পাগুলো কাঁপতে লাগলো, থর থর করে।

বাবাও চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। তবু পুত্রকে সারিয়ে তুলতে যেন সর্বস্ব পণ করলেন। কত দেবদেবীর কাছে মানত করলেন, কত ডাক্তার-বদ্যির ওষুধ আনালেন, তুকতাকে—মন্ত্র-তন্ত্রেরও আশ্রয় গ্রহণ করলেন। কিন্তু হায়রে হায়! ধীরে ধীরে রোগটা বাঁকা পথই ধরলো।

ভাইটিও কেমন যেন মুষড়ে পড়লো। লুকিয়ে লুকিয়ে শুধু কাঁদতো, আর যখন তখন বসে থাকতো ভাইর মাথার ঠিক কাছটিতে। মুখে জল দিতো, গায়ে ও মাথায় হাত বুলিয়ে দিতো, আর একমনে ঠাকুর দেবতাকে ডাকতো। কখনও মনে মনে ভাবতো, আমি যদি বড় হতাম এবং ডাক্তার হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই সারিয়ে তুলতাম।

ডাক্তারের কথাই সত্য হলো শেষ পর্যন্ত। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। সবাই কাঁদলে, কিন্তু কাঁদলে না সেই ভাইটি। বুঝিবা চোখের সবটুকু জল ঝরে গেছে আগেই। মৃত ভাইটির শয্যার উপর বসে মৃতদেহকে স্পর্শ করতেই তার মনের কোণে ভেসে উঠলে কত অজস্র ম্লান মুখ, ক্রন্দনরত কত পিতামাতা ভাই বোন। ঐ ভয়ংকর স্প্রুরোগে আক্রান্ত হয়ে কত কুঁড়ি অকালে ঝরে পড়ছে, কত মায়ের বুক

প্রতিদিন খালি হচ্ছে, আর কতভাই তারই মত বুকফাটা হাহাকার করছে।

সহসা তার অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন রূপান্তরিত হলো ক্রোধে। যত রাগ-সবই কেন্দ্রীভূত হলো ঐ স্প্রু রোগটার উপরে। মৃত ভাইর সেই নিষ্পন্দন দেহটাকে স্পর্শ করে মনে মনে বললে—হে দুরারোগ্য "স্প্রু", তুমি আমার ভাইটিকে কেড়ে নিয়ে আমাকে ভ্রাতৃহীন করেছো। আমি তোমাকে সহজে ছাড়বো না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যেমন করে পারি ডাক্তার হবো এবং প্রতিষেধক আবিষ্কার করবো। পৃথিবীর কোন ভাইকে তোমার করালগ্রাসে আর পতিত হতে দেবো না।

আত্মীয় স্বজনকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে দেখলে ক্ষণিকের জন্য মানুষের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। মনের ক্ষত যত গভীর হোক না কেন সময় তাকে ভুলিয়েও দেয়। কিন্তু ভুলতে পারলে না সেই তরুণ ভাইটি। ভাইয়ের শোক প্রকাশ করলে পড়াশোনার মাধ্যমে। ভালভাবে পড়তে হবে, পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে হবে, তা না হলে ডাক্তারী পড়া যাবে না। আর ডাক্তার না হলে স্প্রুরোগকে বিতাড়িত করা যাবে না। ব্যর্থ হবে সেদিনের প্রতিজ্ঞা।

একদিন পূর্ণ হলো মনের আশা। তরুণটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল প্রথমে বিভাগে। বাবাকে বললে—বাবা, আমি ডাক্তারী পড়বো।

বিষণ্ণ মুখে বাবা বললেন—ডাক্তারী পড়তে যে অনেক খরচ! কেরাণীর ছেলের এমন স্বপ্ন না দেখাই ভাল পুত্র! কেরাণী হওয়ার বিদ্যেতো লাভ করেছো, আর কেন?

—না বাবা, ডাক্তারী আমাকে পড়তে হবে—ডাক্তার আমাকে হতেই হবে! আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি!

পুত্রের কণ্ঠের দৃঢ়তা দেখে বাবা যেন চমকে উঠলেন। ডাক্তার

হওয়ার স্বপ্ন তার আছে, বহুবার ব্যক্তও করেছে। কিন্তু ওর কথায় বড় একটা আমল দেননি তিনি। কিন্তু তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার যে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত তারই পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তিনি হতাশার সুরে বললেন—ডাক্তারী পড়াটা বড়লোকের ছেলেদের জন্য। কেরাণীর ছেলের জন্য নয়রে!

ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করলে তরুণ—তাহলে আমার কী ডাক্তারী পড়া হবে না বাবা?

বাবার বুকটা বার বার কেমন যেন মোচড় দিতে শুরু করলে। এক সময় বললেন—সংসারের খরচ কমিয়ে আমি যতটুকু পারি সাহায্য করবো তোমাকে। কিন্তু সমূহ ব্যয়ভার বহণ করার সাধ্য আমার নেই পুত্র!

তরুণ ওতেই তৃপ্ত হলো। মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে। বললে—ওতেই হবে বাবা। আমিও তো জানি তোমার কথা! তাই আমিও চেষ্টা করবো খরচ কমাতে। আর পরিচিতদের বলবো আমাকে কিছু সাহায্য করতে। রোজগার করতে পারলে সবার ঋণ আমি শোধ করে দেবো বাবা, তুমি দেখে নিও!

রীতিমত কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করলে তরুণটি। নিজে কিছু কিছু রোজগার করলে, কিছু কিছু দান করলে কেউ কেউ এবং বাবাও সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হলো না তার নিরলস প্রচেষ্টা। একদিন কৃতিত্বের সঙ্গে ডাক্তারী পাশ করলে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজ থেকে। প্রমাণ করলে, মহৎ কাজে অর্থের বাধাটা কোন বাধা নয়।

তরুণটি প্রথমে তার নিজের কলেজে কিছু রোজগারের জন্য ডেমনস্ট্রেটারের পদ গ্রহণ করেছিল। সে জানতো, স্প্রুরোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে তাকে যেতে হবে সাগরপারে—সুদূর

লণ্ডনে। সেখানে থাকা খাওয়ার খরচা তো জোগাড় করতে হবে!

সুযোগও একটা এসে গেল। প্রচণ্ড পরিশ্রম সহকারে পড়াশোনা করে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লাভ করলো বৃত্তি। যদিও বৃত্তির আর্থিক পরিমাণটা খুব বেশী ছিল না, তথাপি মনের জোর ছিল ভয়ানক এবং জেদও ছিল প্রবল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই সামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর করে পাড়ি দিলে বিলেতে। আর গবেশকরূপে যোগদান করলে লণ্ডন স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনে।

দুর্ভাগ্য তরুণটির। এত কষ্ট করে বিলেতে আসা তার যেন ব্যর্থ হয়ে গেল। অচিরেই বুঝতে পারলে, যে রোগ সম্বন্ধে সে গবেষণা করতে চায় তার কোন সুযোগ নেই এখানে। বিশেজ্ঞদের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করার পর বুঝতে পারলে, একমাত্র আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোথাও স্প্রুরোগ সম্বন্ধে গবেষণা সম্ভব নয়।

এবারও চিন্তা করার কোন প্রয়োজন অনুভব করলে না তরুণ। নতুন নির্বান্ধব জায়গা, হাতে পয়সা নেই, এখানে গবেষণার জন্য যে বৃত্তিটি সে লাভ করেছে সেটিও হারাতে হবে—ইত্যাদি সে ভুলে গেল জেদের বশেই। জীবনে সে কোনদিন টাকা পয়সার কথা চিন্তা করেনি, আজও করলে না! জাহাজের ভাড়া আর মাত্র পঁচিশ ডলার সঙ্গে নিয়ে চেপে বসলে জাহাজে।

তরুণটির ধারণা ছিল, মার্কিন মুলুকে চাকরি পাওয়াটা জলের মত সোজা। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলে যা ভেবেছিল তা নয়। চেনা শোনা না থাকার জন্য কেউ তাকালে না তার দিকে। বিদেশীকে সহসা কেইবা চাকরি দিতে চায়?

তরুণটি কিন্তু দমবার পাত্র ছিল না। আর ছিল না তার কোন পেশার প্রতি ঘৃণা। ছেলেবেলা থেকে শ্রম করার যথেষ্ট

অভ্যাস ছিল, তাই অবলীলাক্রমে নিজের পদমর্যাদাকে ভুলে গিয়ে পেট চালাতে গ্রহণ করলে একটা কারখানায় কয়লা দেওয়ার কাজ। অর্থাৎ কিনা—সাধারণ এক কুলির কাজ।

খাওয়ার চিন্তা দূর হলো। তরুণ এবার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শুরু করলে যোগাযোগ। কিন্তু না, অনেক চেষ্টা করেও গবেষণার কোন সুযোগ পেলে না। শেষে বহু কষ্টে লাভ করলে সেখানকার এক আর্দালীর এক কাজ। আপততঃ এতেই খুশি হল তরুণ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গবেষণাও শুরু করে দিলে—তবে এ গবেষণা স্প্রুরোগ সংক্রান্ত ছিল না। বিভিন্ন রোগ এবং তার প্রতিষেধকের জন্য নানাধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা মাত্র। অর্থাভাব থাকায় জীবজন্তু কেনার ক্ষমতা ছিল না। তাই প্রাথমিকভাবে তাকে পরীক্ষা চালাতে হয়েছিল রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুর, বেড়ালগুলোর উপর।

সদিচ্ছার জয় এবারও ঘোষিত হলো। এক আর্দালীর গবেষণায় সাড়া পড়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হলেন সবাই। তরুণ এই গবেষকটি সুযোগ পেলে যে বিশ্ববরেণ্য হতে পারবে—এমন ধারণা এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃঢ় হলো। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে প্রদান করা হলো একটি বৃত্তি এবং গ্রহণ করা হলো গবেষক হিসেবে।

এই আর্দালী গবেষকটির নাম ডাঃ ইয়েল্লে প্রাগদা সুব্বারাও। ছাত্রজীবনে এত দুঃখ বরণ, এত পরিশ্রম খুব কম বিজ্ঞানীককে করতে হয়েছে। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের যে সুগভীর ক্ষতকে বুকে ধারণ করে তিনি যে দুশ্চর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা সফল হয়েছিল। কিন্তু সফল করতে তাঁকে ত্যাগ স্বীকারও বড় কম করতে হয়নি।

স্প্রুরোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতে সুব্বারাও বুঝতে পারেন, সামান্য বৃত্তির উপর নির্ভর করলে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত

করা যাবে না। তাই বাধ্য হয়েই গ্রহণ করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব। আর সেই থেকেই তাঁর আর্থিক কষ্টের লাঘব হয়। লাভ করেন সুসজ্জিত গবেষণাগার, প্রচুর সহযোগী এবং প্রচুর যন্ত্রপাতি। যার জন্য অতি অল্পদিনের ভেতরেই আবিষ্কার করেন স্প্রুরোগের প্রতিষেধক। পেলেগ্রা নামে আর একটি দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক ও তাঁর আবিষ্কার।

বহু অ্যান্টিবায়োটিকেরও আবিষ্কারক তিনি। তাদের মধ্যে "সুবা মাইসিন" নামক অ্যান্টিবায়োটিকটি আজও তাঁর নামকে বহন করে চলেছে। তিনি এত বেশী ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন যে, জীবদ্দশায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচিত হয়েছিলেন "আশ্চর্য ওষুধসমূহের আবিষ্কারক অত্যাশ্চর্য ডাক্তার।"



আচার্য জগদীশচন্দ্রের ছেলেবেলা

আশ্চর্য এক ছেলে। যেমন রূপ, তেমনই বিদ্যেবুদ্ধি। দুষ্টুমিতেও বড় কম যায় না। তার উপর ভয়ানক জেদ। জেদ চাপলে উপায় নেই। মা, বোন, চাকর বাকর সবাই নাজেহাল হয়ে যায়।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী এবং সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। ক্ষেতে খামারে কাজ করে যেসব কৃষকরা, মাছ ধরে যেসব ধীবররা, জনমজুরী খাটে যেসব দরিদ্ররা—যাদের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পায় না এবং অবহেলার মাঝখানে বেড়ে ওঠে, তাদেরই জন্য স্থাপন করেছিলেন একটা পাঠশালা। নিজে শিক্ষিত ও ধনী হয়েও, উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থেকেও, প্রচুর সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পুত্রকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন সেই পাঠশালাতে।

দুদিনেই বালকটি পাঠশালার অপরাপর ছেলেদের নিয়ে দিব্যি একটা দল গড়ে নিয়েছিল। তার একেবারে অন্তরঙ্গ দুই বন্ধু ছিল। তার বাবার এক মুসলমান চাপরাশীর ছেলে আর এক জেলের ছেলে। পাঠশালার শেষে ওদের নিয়ে বনেবাদাড়ে ঘুরে ঘুরে

বেড়াতো, পাখীর ছানা ধরতো এবং পোকা-মাকড়দের ধরে এনে দেয়াশালাইর বাক্সে পুরে রাখতো। নানাধরণের গাছপালা ও লতাগুল্মের সঙ্গে পরিচিতও হতে পেরেছিল। গাছগছালির সঙ্গে যেন একটা মিতালি পাতিয়ে ফেলেছিল বালক।

বাড়ীতে ফিরে আসতো রাজ্যের যত ডালপালা, পাখীর ছানা ও পোকামাকড়কে নিয়ে। আর বাড়ীতে এলেই লেগে যেতো কারিগরিতে। উঠানে ডালপালা পুঁতে দিয়ে জল ঢালতো, বলতো কত বড় বড় গাছ হবে. পাখীর ছানাগুলোকে খাঁচায় পুরে খাবার দিতো—বলতো পাখীরা বাচ্চা দেবে, আর উঠানময় হরেক রকমের বীজ ছড়িয়ে দিয়ে বলতো, মস্ত বড় বাগান হয়ে যাবে। শুধু কী তাই! রোজ রোজ কোত্থেকে সব গণ্ডা গণ্ডা গুবরে পোকা ধরে নিয়ে আসতো আর তাদের দেয়াশলাই বাক্সের সঙ্গে জুড়ে দিতো। পোকারা চলতে শুরু করলেই বাক্সটাও চলতো। আনন্দে হাততালি দিতে থাকতো বালক। কেমন গাড়ী চলছে, কী মজা, কী মজা দেখতে ডেকে আনতো বড় দিদিদের এবং মাকে। তাঁরাও বুঝি মজা পেতেন এবং মুচকি মুচকি হাসতেন।

বালকটির যে দেখাশোনা করতো—সে ছিল জেল ফেরত এক ডাকাত। দীর্ঘকাল জেলে থাকার পর সে যখন মুক্তি পেলে, তখন তার খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য ঐ কাজটি দিয়েছিলেন ছেলেটির বাবা। জীবনে বহু চুরি ডাকাতি করেছিল, গুণ্ডামি করেছিল, খুনজখমও করেছিল। তবুও বাবা তাকে নিয়োগ করেছিলেন ছেলের দেখাশোনার কাজে।

লোকটির শুধু কাজ ছিল, সন্ধ্যা হলে কিছু দূরে ছোট্ট এক নদীর বুকে লোকজন পারাপারের একটা সেতুর কাছে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া, পুনরায় কাঁধে করে বাড়ীতে ফিরে আসা। সে নদীটি ছিল পদ্মানদী থেকে একটা কাটা খাল। বালক সন্ধ্যার সময় নদীর তীরে বসে থাকতো আর লোকটির মুখে তার ডাকাতির

গল্প, জেলখানার গল্প আর ধরা পড়লে লোকজনদের সঙ্গে লড়াই করার গল্প শুনতো। লোকটি ভাল গল্প বলিয়েও ছিল। তার মুখে ডাকাতি করার লোমহর্ষণ কাহিনীগুলো শুনতে শুনতে বালক একেবারে তন্ময় হয়ে যেতো। জিজ্ঞাসা করতো—তুমি ডাকাতি করা কেমন করে শিখেছো?

অর্থপূর্ণ হাসি হেসে লোকটি বলতো—সব বিদ্যের গুরু আছে খোকাবাবু! আর এই বড় বিদ্যের গুরু থাকবে না!

—তুমি কেমন করে লড়াই করতে—আমাকে শিখিয়ে দাও না!

—দেবো, দেবো, আর এট্টুখানি বড় হও—তখনই শেখাবো কুস্তি। কুস্তি করতে বালকের খুব ভাল লাগে। বলে—না, এক্ষুনি আমাকে শিখিয়ে দাও! আমি তোমার সঙ্গে কুস্তি করবো।

লোকটি হেসে বলে—তোমাকে ঠিক কুস্তির প্যাঁচ শিখিয়ে দেবো খোকাবাবু, দেখে নিও!

জেদি ঐ বালকটির কাছে বুঝিবা হার মানতে বাধ্য হতো লোকটিকে। শেখাতে হতো কুস্তির প্যাঁচ।

বাড়ীতে বসে থাকতে চাইতো না ছেলেটি। বিশ্বপ্রকৃতি তার নিজস্ব রূপটাকে যেন উজাড় করে দিয়েছিল পাঁচ বছরের সেই শিশুটির কাছে। উপরের খোলা আকাশটা দেখে কেমন যেন উদাসী হয়ে উঠতো, দূরের কালো কালো ছায়ার মত গ্রামগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকতো. আর সবুজ সবুজ মাঠগুলো তার মনকে সবুজ রঙে রাঙিয়ে দিতো। ধানেভরা মাঠ, জলেভরা নদী, ফুলে ভরা বন তাকে যেন আহ্বান জানাতো—বুকে আগুন ধরিয়ে দিতো। ঘরের চার দেওয়ালের ভেতরে মনটা তার হাঁফিয়ে উঠতো যেন।

সব চেয়ে ভালবাসতো সন্ধ্যায় নদীর তীরে বসে থাকতে। নদীর কুল কুল শব্দের মধ্যে বুঝিবা শুনতে পেতো কত কথা—কত

গান। সন্ধ্যায় সাদা মেঘের টুকরোগুলোর মত, বলাকার সারির মত, নদীর বুকের ছোট ছোট ঢেউর মত যেন সুদূরের দিকে ছুটে যেতো মন—বুঝিবা হারিয়ে যেতে চাইতো। ঐ ঢেউগুলোর মতই কত প্রশ্ন উঠতো মনে। কোথা থেকে আসে নদী—কোথায় যায়! কেনই বা ঢেউ উঠে আবার মিলিয়ে যায়! এসব কথা সে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারতো না, খুলে বলারও শক্তি ছিল না। কেবল হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো নদীর দিকে।

শুধু গল্প শুনতে নয়, রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলোও সে তন্ময় হয়ে শুনতো। রোজ বিকেলে মাকে পড়তে হতো রামায়ণ কিংবা মহাভারত। রামের সত্য পালন, মেঘনাদ ও কর্ণের বীরত্ব, সততার প্রতি কর্ণের নিষ্ঠা, কিংবা নিরস্ত্র অবস্থায় কর্ণ ও মেঘনাদের হত্যা তার বালক চিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিতো। প্রশ্নে প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত করতো মাকে।

বালকের পিতাও ছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি বেজায় শ্রদ্ধাশীল। সাধারণ মানুষের শিক্ষার জন্য এখানে ওখানে শিল্পমেলা এবং কৃষিমেলার ব্যবস্থা করতেন। মেলা চালাকালে মেলাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে ব্যবস্থা করতেন যাত্রা ও কথকতার আসর। সে সময় যাত্রা ও কথকতা—সবই হতো রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীগুলোকে অবলম্বন করে।

রামায়ণ ও মহাভারতের একান্ত ভক্ত বালক কথকতা ও যাত্রার নাম শুনলে অস্থির হয়ে উঠতো। যতদূরে আসর বসুক না কেন নিয়ে যেতে হতো তাকে। কচি ছেলে—তবু ঘুমাতো না, প্রতিটি দৃশ্য গোগ্রাসে গিলতো যেন। তার সবচেয়ে ভাল লাগতো যুদ্ধ দেখতে। যোদ্ধারা আসরে যখন তরবারি ঘুরিয়ে যুদ্ধ করতো, তখন বালক ভাবতো মনে মনে, হায়রে হায়! আমারও যদি ঐ রকম একটা তরবারি থাকতো তাহলে কর্ণকে মরতে দিতাম না, আহা বেচারা! শেষ সময়ে রথের চাকাটাও মাটিতে পুঁতে গেল,

ভুলেও গেল সব বিদ্যে। আর সুযোগ পেয়ে অর্জুন তাকে মেরেই ফেললে।

মহাভারতের অভিমন্যুকেও ভাল লাগতো বালকের। অভিমন্যুর কথা শুনতো আর যাত্রার আসরে দেখতোও। কতটুকু ছেলেটা! আর কী বীর! যত মহাবীর সবাই মিলে একযোগে চক্রব্যূহ রচনা করে মেরে ফেললে সেই বালককে। তার কাঁচ মনটা বার বার নড়ে উঠতো অভিমন্যুর জন্য।

তখনকার দিনে গাড়ীর এত প্রচলন ছিল না। অনেকেই ঘোড়ায় চড়ে যেতো. কারও আবার ঘোড়া গাড়ীও ছিল! বালক দেখতো, কেমন টপবগ করে ঘোড়া ছুটে যায়! খুরের তালে তালে খটাখট শব্দ উঠে, রাস্তার ধুলো উড়ে যায়, আরোহী কেমন লাগাম চেপে ধরে আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে কত দূর দূরান্তরে এগিয়ে যায়। কেমন মজা!

একদিন বাবাকে বললে—বাবা, আমি ঘোড়া নেবো!

বাবা হেসে বললেন—ঘোড়া নিয়ে কী করবি শুনি? খেলা করবি?

বালক বললে—উঁহুঁ। ঘোড়ায় চড়বো, খু-উ-ব—খু-উ-ব জোরে ঘোড়া ছোটাবো। তুমি দেখে নিও বাবা।

বাবা ছেলের আগ্রহ দেখে একটা টাট্টু ঘোড়া কিনে দিলেন। ছোট্ট অথচ সুন্দর। বালককে বললেন বাবা—তুই ছেলেমানুষ কিনা! এখন ছোট ঘোড়ায় চড়, পরে বড় ঘোড়া কিনে দেবো।

বালক তাতেই খুশি। আর ঘাড়ে চড়ে সে বেড়াতে যায় না। ঘোড়ার পিঠে লাগাম ধরে বসে আর সেই জেল ফেরত ডাকাতটি ধরে ধরে নিয়ে যায়। দুর্দান্ত সাহসও বালকটির। ঘোড়ার পিঠ থেকে সে সহজে নামতে চায়না, একাই ঘোড়াকে চালাতে চায় এবং আরও—আরও জোরে ঘোড়া ছুটাতে চায়!

সেবার বাড়ীর কাছে এক ময়দানে আয়োজন হলো ঘোড়দৌড়

প্রতিযোগিতা। লোকে লোকারণ্য মাঠ। প্রতিযোগীরা ঘোড়া নিয়ে তৈরি। এমন সময় টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে সেই ছেলেটিও হাজির। বললে—আমিও ওদের সঙ্গে ঘোড়া ছোটাবো।

দর্শকদের আর আনন্দ ধরে না। তারা বারবার হাততালি দিয়ে ছেলেটাকে উৎসাহিত করলো। আর মজা দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো।

যথা সময়ে ঘোড়ারা ছুটতে আরম্ভ করলো। আর ছ বছরের সেই বালকটিও তাদের সঙ্গে ছোটালে ঘোড়া। ছোট্ট সেই টাট্টু ঘোড়াটা পারবে কেন বড় বড় ঘোড়াদের সঙ্গে পাল্লা দিতে? কিন্তু বালক যেন হার মানতে রাজি নয়। আরও জোরে, আরও জোরে ছোটালো ঘোড়া। সপাং-সপাং করে লাগাতে লাগালে চাবুকের পর চাবুক।

সত্যিই যেন বড় বড় ঘোড়াদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে শুরু করলে টাট্টু ঘোড়াটা। কিন্তু টাল সামলাতে পারলেনা বালক। এক সময় ছিটকে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠে থেকে। গায়ে হাতে চোট লাগলো বটে কিন্তু দুর্বলতা আদৌ প্রকাশ করলেনা। ধুলো ঝেড়ে ঘোড়া ধরতে এগিয়ে গেলে। হুট করে হার মানার পাত্র সে নয় তাই পুনরায় চেপে বসলে ঘোড়ায় এবং জয় লাভ করতে না পারলেও নির্দিষ্ট পথটা কিন্তু অতিক্রম করলে।

সেই পাঁচ-ছ বছর বয়সে বালক হাতে নাতে অনেক কিছু তৈরিও করতে পারতো। উদ্ভাবনী শক্তি ছিল যথেষ্ট। নানাধরণের খেলনা তৈরি করতো, গাড়ী বানাতো আর নদীর বুকে সাঁকোর মত উঠানে খাল কেটে সাঁকো তৈরি করতো।

স্থানীয় দরিদ্র ছেলেমেয়েরা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য বাবা একটা শিল্পশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছিলেন। ছেলেরা সেখানে যেতো, নানা ধরণের হাতের কাজ শিখতো এবং হাতে নাতে কিছু কিছু তৈরী করতো।

বালকটি কিন্তু ওখানে যেতে খুব পছন্দ করতো। সেও হাতের কাজ শিখতো এবং মনের মত খেলনা তৈরি করতো। বালকের আবার বন্দুক কামানের প্রতি বেজায় আগ্রহ। মাকে বললে—মা, আমি একটা কামান তৈরি করবো।

মা হেসে বললেন—বেশ তো, তৈরী করিস!

—তাহলে তোমার ঐ থালা, বাটি আর গেলাসগুলো দাও।

মা আকাশ থেকে পড়লেন যেন। বললেন—এগুলো নিয়ে আবার কি করবি তুই!

বালক গম্ভীর গলায় বললে—কামান তৈরী করবো।

মা গালে হাত দিলেন। বললেন—এগুলো যে পেতলের জিনিস—দামীও।

—দাও না! দেখবে কেমন চমৎকার কামান বানিয়ে দেবো।

মা আর কী করেন! জেদ যখন একবার ধরেছে, নেবেই। তার চেয়ে ভালয় ভালয় তার পছন্দ মত জিনিসগুলো দিয়ে দিলেন।

বালক বাসনগুলো নিয়ে কারখানায় গেল আর লেগে গেল ঠুক ঠাক আর কাট কুট করতে। মা জিনিসগুলোর তদারকও করলেন না। জলে গেল মনে করে চুপ করে গেলেন।

কয়েকদিন পরে একটা চমৎকার পেতলের তৈরি খেলনা কামান নিয়ে ছুটে এলো মায়ের কাছে। বললে—দেখ, দেখ মা, কেমন একটা কামান তৈরি করেছি!

হাতে নিয়ে মা অবাক হয়ে গেলেন। এমন নিখুঁত যে, পাকা শিল্পীকেও হার মানতে হয়। দেখার মত সত্যই চোখ আছে বালকের আর অনুকরণের ক্ষমতাও প্রচণ্ড।

বালক ধীরে ধীরে বড় হলো। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হলো একদিন। বাবা এবার বালককে নিয়ে গেলেন কলিকাতায় এবং ভর্তি করিয়ে দিলেন সেন্টজেভিয়ার্স স্কুলে। গাঁয়ের ছেলে এলে

শহরে। নতুন পরিবেশ, নতুন নতুন লোকজন—বালক কিন্তু আদৌ ঘাবড়ালে না। বয়স তখন মাত্র এগার বছর।

ক্লাসের বেশীর ভাগ ছেলে ইওরোপীয়দের সন্তান আর কিছু স্থানীয় অবস্থাপন্নদের বাড়ীর। তারা গাঁয়ের ছেলেকে বুঝি বরদাস্ত করতে পারলে না। ভাবলে ওকে স্কুল থেকে তাড়াতে হবে।

ছেলেরা চুপি চুপি যুক্তি করে নিলে নিজেদের ভেতরে। তারপর স্কুল ছুটির পর ডাকলে বালকটিকে। তাদের মধ্যে তাগড়া একটা ছেলে যেন এগিয়ে এসে বললে—তোমাকে স্কুল ছাড়তে হবে। পড়তে পারবেনা এখানে।

ভয় পাওয়ার ছেলে বালকটি ছিল না। আর কারও কাছে নতি স্বীকার করতে তার ধাতে নেই। তাগড়া সেই ছেলেটার মুখের উপরই বলে দিলে—না, আমি স্কুল ছাড়বোনা।

অপরাপর যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বললে—স্কুল না ছাড়তে গেলে আমাদের দলপতির সঙ্গে লড়তে হবে তোমায়। যদি জয়লাভ কর তাহলে থাকতে পারবে, আর যদি হেরে যাও তাহলে তোমাকে পালাতে হবে। কেমন রাজি আছো?

বালক জিজ্ঞাসা করলে—তোমাদের সবার সঙ্গে আমায় একাকেই লড়তে হবে?

—না দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে হবে আমাদের ঐ দলপতির সঙ্গে। পারবে?

—আলবৎ পারবো।

সহজেই সম্মত হয়ে গেল বালক। কিন্তু প্রতিপক্ষ সেই তাগড়া ছেলেটি—বয়সও তার চেয়ে অনেক বেশী। তথাপি আদৌ ভয় পেলেনা। এগিয়ে এল দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে।

স্কুলের মাঠেই শুরু হয়ে গেল লড়াই। কিন্তু কেউ কম যায় না। বয়স কম হলে কী হবে, নিয়মিত শরীরচর্চা করতো এবং তার

সঙ্গী সেই ডাকাত সর্দারটির কাছ থেকে কিছু প্যাঁচও আয়ত্ত করেছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত তুমুলভাবে লড়াইর পর জয়লাভ করলো বালকটি। বিশালদেহী তাগড়া বালকটি এক সময় ছিটকে পড়লো দূরে। এবার কিন্তু সব ছেলেরা আক্রমণ করেছিল তাকে। তাতে পরাজিতও হয়েছিল। তবে স্কুল ছাড়তে হয়নি।

এই দুঃসাহসী, জেদী, কারিগর ও প্রকৃতি প্রেমিক বালকটি ভারতমাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। বিজ্ঞান রাজ্যের এক বিস্ময়। পরাধীন ভারতের ইনিই প্রথম বিজ্ঞানী—যিনি ভারতের নামকে বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

জীবন মরণ পণ করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পেঁছাবার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানানোর দুর্লভ চরিত্রের অধিকারী তিনি বাল্যেই হয়েছিলেন। তাই উত্তরকালে পরাধীন দেশের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী রূপেও পরিচিত হতে পেরেছিলেন। প্রচন্ড জেদ থাকায় এবং ছেলেবেলা থেকে কোনকিছুর কাছে নতি স্বীকার প্রবণতা না থাকায় তিনি দেশীয় মিস্ত্রীদের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি তৈরী করে নিয়ে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং জয়লাভও করেছিলেন। অপরদিকে তিনি নিজে ছিলেন এক ভাল কারিগর এবং এই অভ্যাসটিও গড়ে উঠেছিল তাঁর ছেলেবেলায়।



নোবেলজয়ী রামনের ছেলেবেলা

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো বছর পনেঁর বয়সের এক বালক। অংক ও যেকোন বিজ্ঞানসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ভারি আগ্রহ তার। যেখানে যত সমস্যা চোখে পড়তো সবই নিয়ে বসতো এবং সমাধানের জন্য দিনের পর দিন চিন্তা ভাবনা করতো। যতক্ষণ বা যতদিন সমাধানের উপায় খুঁজে না পেতো ততদিন কোনরকম স্বস্তি পেতো না মনে।

বালকের এই স্বভাবের কথা জানতো তার সহপাঠীরা। তারা উৎসাহিত করতো, নতুন নতুন সমস্যা এনে হাজির করতো এবং অনেক সময় নিজেরাও সচেষ্ট হতো সমাধানের উপায় খুঁজতে।

আপ্পারাও নামে বালকের এক সহপাঠী ছিল। গলায় গলায় ভাব দুজনের এবং পড়াশোনায়ও ভাল ছিল। মাঝে মাঝে সে নিজেও সমস্যা খুঁজতো এবং তেমন কোন দুরূহ সমস্যা পেলে বন্ধুর সঙ্গে মিলে সমাধানের উপায় বার করতে চেষ্টা করতো।

একদিন আপ্পারাও এর চোখে পড়লো একখানা বিজ্ঞান পত্রিকা। সেই পত্রিকাটিতে দেখলে, বিলেতের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালে শব্দবিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলো মতবাদ রেখেছেন।

আপারাও খুব আগ্রহ সহকারে বার বার পড়লে, কিন্তু আদৌ বুঝতে পারলে না। তখন সেই মতবাদগুলো এনে হাজির করলে বন্ধুর সামনে। বললে—বন্ধু, এই দেখ বিজ্ঞানী ব্যালের নতুন মতবাদ। সমাধান করতে পার কিনা দেখ।

বালকটি উৎসাহের সঙ্গে দেখলে সেই মতবাদ গুলোকে, কিন্তু সেও ব্যর্থ হলো। তখন দুজনে মিলে সমাধানের পথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করলো। পারলে না। এরপর বালকটি অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গেও আলোচনা করলে, তাতেও সম্ভব হলো না।

বালকটি এবার মহাচিন্তায় পড়লে। শেষে উপায় না দেখে একদিন হাজির হলে কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ জোনস-এর কাছে। মিঃ জোনস খুব ভাল করে দেখলেন, অনেক চিন্তাভাবনা করলেন, বড় বড় বইর সাহায্য গ্রহণ করলেন, তথাপি খুঁজে পেলেন না সমাধানের সূত্র।

বালকটি কিন্তু দমবার পাত্র ছিল না। যতই ব্যর্থতা বরণ করতে লাগলে ততই তার জেদ চেপে বসলে। ভাবলে—যিনি মতবাদ রেখেছেন, তিনি নিশ্চয়ই এর সমাধানের উপায় বার করেছেন। এটি আবার বৈজ্ঞানিক সমস্যা, মনগড়া কিছু বলার উপায় নেই। অতএব কেন খুঁজে পাওয়া যাবে না সূত্র?

বালক এবার ক্লাসের পড়া ছেড়ে, নাওয়া খাওয়া একরকম ভুলে ডুব দিলে সমস্যাগুলোর ভেতরে। সমাধানের উপায় বার করবেই।

মনের জোরের কাছে গায়ের জোরও হার মানে। উদ্যম না হারালে, নিরুৎসাহ না হয়ে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেলে, ব্যর্থতায় মুষড়ে না পড়ে ভাবনা চিন্তা অব্যাহত রাখলে, সার্থকতা আসতে বাধ্য হয়। ঘন মেঘের আড়ালে সূর্যের মত সমস্যা সাময়িক। কাঁটাকে ভয় করলে যেমন গোলাপ পাওয়া যায় না, শক্ত পাথরকে ভয় করলে তেমনি পাথরের তলায় আবদ্ধ স্বচ্ছ জলের ধারাকে

পাওয়া যায় না। বিদঘুটে খোসাকে ভয় করলে যেমন বাদামের সুমিষ্ট স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয় তেমনই ভয়ে পেছিয়ে না থেকে বা হাল না ছাড়লে যে একদিন সফলতা আসে—তা অচিরেই প্রমাণ করল বালকটি। সমাধানের উপায় একটা বার করল।

কিন্তু এ কি কাণ্ড! সমাধান করলো বটে, আবার নতুন সমস্যার জালে যে ছড়িয়ে পড়তে হলো! মাকড়সার জালের মত শিকারীর ফাঁদের মত একটা খুলতে না খুলতে অন্য পাঁচটায় জড়িয়ে পড়ল।

এবারেও ঘাবড়ালো না বালক। ভাবলে, আসল সমস্যার যখন সমাধান হয়েছে—তখন এগুলো আর কতক্ষণ। স্বয়ং সেনাপতি পরাজিত—তার চেলা চামুণ্ডারা আর কী করতে পারে।

হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত তাই হলো। সব জোটবন্ধন এ'কে একে খুলে গেল। ঝড়ের শেষে আকাশের মত, রাতের শেষে দিনের মত, ত্রিশিরা কাচে সূর্যরশ্মির সাত রঙের পটির মত একে একে সব পরিষ্কার হয়ে উঠলে বালকের কাছে। তবু সমাধানটা সঠিক হলো কিনা এবং নতুন সমস্যাগুলোর উদ্ভব সম্ভব কিনা যাচাই করতে আগ্রহী হয়ে উঠলে। কিন্তু যাচাই করবে কে?

অনেক ভেবেচিন্তে বালক শেষ পর্যন্ত সেই লর্ড র‍্যালেকেই চিঠি লিখে বসলে। এতবড় বিজ্ঞানী, এত যাঁর নাম ডাক, তিনি কি সামান্য এক কলেজে পড়া ছেলের চিঠির উত্তর দেবেন? বালক আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলে।

না, যথা সময়েই চিঠির উত্তর এলো। র‍্যালে জানালেন, চিঠি পেয়ে বেজায় খুশি হয়েছেন তিনি। শুধু কী তাই? বালকটির সমস্যার কথা ও সমাধান দুইই প্রকাশ করলেন বিলেতের এক নামকরা বিজ্ঞান পত্রিকায়। মন্তব্য করলেন, এই বালক উত্তরকালে একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হতে পারবে।

র‍্যালের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। এই বালকই উত্তরকালে

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করে ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। নাম চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন। তাঁর আবিষ্কারটি পদার্থ বিজ্ঞান "রামন এফেক্ট" নামে খ্যাত। এই এফেক্ট বা ক্রিয়ার মূল কথা হলো কোন বস্তুর অণুর সঙ্গে আলোক রশ্মির সংঘাত ঘটলে আলোকের কম্পনসংখ্যা হয় বৃদ্ধি পাবে, নয়ত হ্রাস পাবে। আর এরই প্রভাবে ঘটবে আলোকের বিকিরণ।

রামন উত্তরকালে যে একজন বড় বিজ্ঞানী হবেন তার প্রমাণ শুধু উপরের ঘটনাটি থেকে লাভ করা যায়নি, ছোটবেলায় আরও বহু ঘটনা থেকে জানা গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত। লেখাপড়ায় ছিল প্রবল আগ্রহ। বিশেষ করে অংক কষার নেশা যেন ছেলেবেলা থেকে পেয়ে বসেছিল তাঁকে। তার ওপর ছিল প্রকৃতি প্রেমী। সেই ছোটবেলায় নিজের বাড়ীর চারপাশে গাছ গাছড়া লাগিয়ে এবং তাদের পরিচর্যা করে যেন একটা কৃত্রিম বন সৃজন করেছিলেন। তিনি শুধু ফুলের বাগানের ভক্ত ছিলেন না। যে কোন গাছের প্রতি ছিল তার গভীর মমত্ববোধ। ছেলেবেলায়ও তিনি গাছকে কাটতে দিতেন না। 'গাছকে কেটে ফেলতে দেখলে বড় ব্যথা অনুভব করতেন।

চন্দ্রশেখর ভেংকট রামন ছিলেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। বাবা-মা উভয়েই ছিলেন বেজায় ধর্মভীরু। বাবার কাছে বসে যেমন অংকের অভ্যাস করতেন তেমনই মায়ের কাছে লাভ করতেন ধর্মীয় ভাবনা। সেই বয়সে তিনি সঙ্গীতের প্রতিও অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

রামন বাল্যকালে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করতেন। পড়েছিলেন বহু ধর্মগ্রন্থ। সে তুলনায় বিজ্ঞানের বই পাঠ করতেন নামে মাত্র। যেখানে ধর্ম-সম্বন্ধে আলোচনা হতো, সেখানেই হাজার কাজ ফেলে ছুটতেন তিনি। কথিত আছে অল্প বয়সে ধর্মপ্রাণা অ্যানি বেশান্তের ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা তাঁর মনে

গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। কিছুদিন ধর্ম ধর্ম করে যেন পাগল হয়ে উঠেছিলেন। অল্প বয়সে ধর্ম সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন তিনি এবং সেগুলি যথেষ্ট উচ্চমানের ছিল। নিজের ধর্ম, নিজের দেশ, নিজের জাতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন সেই বাল্য বয়সেই। এতবড় বিজ্ঞানী হয়েও, দেশ-বিদেশের মানুষের সঙ্গে এত যোগাযোগ সত্ত্বেও কোনদিন জাতীয়তা পরিত্যাগ করেননি। বাল্যকাল থেকেই নিরামিষ আহার করতেন এবং জাতীয় পোষাক পরতেন।

বালক রামন মেধাবীই ছিলেন। বড় হলে তাঁর বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল অঙ্ক ও পদার্থবিদ্যা। পিতা অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু চেয়েছিলেন পুত্র ইতিহাস নিয়ে কলেজে পড়াশোনা করুক। তাঁর ধারণা ছিল, ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করলে সহজে চাকরি জোগাড় করা যাবে। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর বালক রামন নিজেই বেঁকে বসলেন। বিজ্ঞান নিয়ে তিনি পড়বেনই।

পুত্রের ইচ্ছার আর বিরোধিতা করলেন না পিতা। ভর্তি করিয়ে দিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে। বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। দুটি পরীক্ষায়ই তিনি লাভ করেছিলেন সরকারী বৃত্তি। স্বর্ণপদক প্রদান করে তাঁকে সম্মানও জানানো হয়েছিল।

রামনের অসাধারণ মেধার জন্য অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছিলেন. তাঁকে বিলেতে পাঠাবার জন্য। রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য তাঁকে বিলেতে পাঠানো হয়নি। পিতামাতার সে রকম উচ্চাশাও ছিল না। মধ্যবিত্ত বাড়ীর ছেলে। কিছু রোজগার করবে এবং সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে। ধনের আকাঙ্ক্ষা কিংবা যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের মনে বিন্দু মাত্র স্থান পায়নি। আর ঐ কারণেই উচ্চশিক্ষা লাভের পর

তরুণ রামনকে সরকারী চাকরির জন্য আসতে হয়েছিল কলিকাতায় প্রতিযোগিতামূলক এক পরীক্ষায় বসার জন্য।

প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থানই অধিকার করেছিলেন রামন এবং কলিকাতাতেই লাভ করেছিলেন চাকরি। কথিত আছে, কলিকাতার আচার্য মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক স্থাপিত "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সে"র প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং এইখানে শুরু করেন গবেষণা। সে সময় মহেন্দ্রলাল সরকার অবশ্য বেঁচে ছিলেন না।

এই গবেষণাগারে গবেষণা করেই রামন লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কার। একেবারে দেশী সংস্থা এবং এই একটি মাত্র ভারতীয় সংস্থাই একজন ভারতীয়কে নোবেল পুরস্কার এনে দিতে পেরেছিল। আজও পর্যন্ত অপর কোন ভারতীয় সংস্থা এমন গৌরব অর্জন করতে পারেনি। অপর পক্ষে রামন লাভ করেছিলেন দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী। বিদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেননি বা বিদেশের কোন গবেষণাগারে গবেষণাও করেননি। নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা ও সততার বলেই রামন দেশের মাটিতে গবেষণা করে বিশ্বজয়ী হতে পেরেছেন—এই ঘটনা তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষে কম গৌরবের নয়।



জ্যোতির্বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার ছেলেবেলা

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে অবিভক্ত বাংলার বুকে প্রথমে যে মৃদু কম্পন জেগেছিল, তার তরঙ্গ ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে প্রবল ঝড়ে বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের মত উত্তাল হয়ে উঠলো। তুষের আগুনের মত ধুমায়িত অসন্তোষ শেষ পর্যন্ত দাবানলের আকারে ছড়িয়ে পড়লো পল্লীতে পল্লীতে, ঘরে ঘরে, ইস্কুলে কলেজে। কেবল রাজনৈতিক নেতারা নন, বঙ্গভঙ্গ রদ করতে আন্দোলনের সামিল হলেন সাধারণ মানুষ থেকে তরুণ ছাত্ররা পর্যন্ত সবাই। সর্বত্র শুরু হয়ে গেল বিদেশী দ্রব্য বর্জন, স্বদেশী জিনিস গ্রহণ, স্কুল-কলেজ বয়কট ইত্যাদি।

ঢাকা শহরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছেলেরা আন্দোলনের ব্যাপারে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কয়েকজন ছাত্রনেতার তত্ত্বাবধানে স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্ম হলো ব্যাহত। নির্বিরোধী যেসব ছাত্ররা পড়াশোনার জন্য আসতো, যারা প্রবল রাজশক্তির বিরাগভাজন হতে চাইতো না, তাদেরও বুঝিয়ে সুজিয়ে আন্দোলনের সামিল করে নিলেন ছাত্রনেতারা। এবার রীতিমত সাড়া পড়ে গেল সরকারীমহলে। ছাত্র আন্দোলনকে দমন করতে

তাঁরা নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাতে লাগালেন। শেষে স্কুল পরিদর্শন করার জন্য দিন স্থির করলেন তৎকালীন পূর্ববাংলার ছোটলাট স্যার বমফিল্ড ফুলার।

ছাত্ররা এবার নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করার জন্য সমবেত হলেন। আলোচনার পর স্থির করলেন, লাটসাহেব যেদিন বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসবেন সেদিন প্রত্যেকেই তাঁরা ক্লাসে যাবেন এবং ইংরাজ অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লাটসাহেবের সামনে পিকেটিং করতে করতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করবেন।

যথাসময়ে ফুলার এলেন। ছাত্ররাও পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নানাধরণের ব্রিটিশ বিরোধী ধ্বনি তুলতে তুলতে যে যার ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এলেন এবং সমবেত হলেন স্কুল চত্বরের বাহিরে একটা ফাঁকা জায়গায়।

এবার ছাত্রদের সামনে একে একে বক্তব্য রাখলেন নেতারা। নেতাদের মধ্যে ছিলেন চৌদ্দ বছরের এক মেধাবী ও সুদর্শন তরুণ। তাঁরই জিভের ধারটা ছিল বেশী। তীব্র জ্বালাময়ী বক্তৃতায় ব্রিটিশের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে সবাইকে জানালেন আহ্বান।

লাটসাহেব শুনলেন সব, চোখেও দেখলেন এখানকার পরিস্থিতি। তক্ষুণি তেলেবেগুণে জ্বলে উঠলেন যেন। সমস্ত ছাত্রনেতাকে বহিঃস্কৃত করলেন স্কুল থেকে। আর সেই মেধাবী তরুণটির নিষিদ্ধ করেছিলেন পড়াশোনা।

ছাত্রনেতা সেই তরুণটিই বিশ্বের প্রথমসারির বিজ্ঞানী ডাঃ মেঘনাদ সাহা। একাধারে বিজ্ঞানী, লেখক ও রাজনীতিবিদ। বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর অবদান যেমন স্বর্ণাক্ষেরে লেখা হয়ে আছে, তেমনই ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও আছে অসামান্য অবদান।

অত্যন্ত দরিদ্র এক পরিবারে জন্ম মেঘনাদের। ছেলেবেলায় ছিলেন অত্যন্ত সরল, শান্ত ও নির্বিরোধী। কিন্তু মেধা ছিল

প্রচণ্ড। যা একবার শুনতেন—তা যেন চিরকালের জন্য মনে গেঁথে ফেলতেন।

মেঘনাদ প্রথম লেখাপড়া শুরু করেন গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অক্ষর ও সংখ্যাসম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পর বালকের গণিতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ পায়।

পিতার ছিল একটি মুদির দোকান। ওতে যা রোজগার হতো তাতেই কোন রকমে সংসার চলে যেতো। পিতার হয়ত ইচ্ছা ছিল, বালক মেঘনাদ বড় হয়ে ঐ দোকানেরই ভার গ্রহণ করুক। তাই মাঝে মাঝে ছেলেকে বসাতেন কাছে। খরিদ্দার না থাকলে ছেলেকে পড়াতেনও। মালবিক্রির জন্য যে সব ছেঁড়া লেখা কাগজ ব্যবহৃত হতো, বালক সেগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পড়তো। অপরদিকে ঐ লেখা কাগজগুলোর উপরই লেখার অভ্যাস করতে হতো বালককে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালেই বালকের প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল। বিশেষ করে অঙ্কের ক্ষেত্রে। এই বয়সে তিনি বহু দুরূহ অঙ্কের সমাধান করতে পারতেন, বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগকে মুখে মুখে করে দিতে পারতেন, দোকানের হিসেব রাখতেন এবং বাবার হিসেবেরও ভুল ধরতে পারতেন।

প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় বেশ কৃতিত্বের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মেঘনাদ। তবে কোন বৃত্তি তিনি লাভ করতে পারেন নি। বাবার ইচ্ছা ছিল, মেঘনাদের পড়াশোনায় এইখানেই ইতি হোক। কাছে পিঠে কোন উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না, ছিল না বাইরে রেখে পড়াবার সামর্থ্য। তাই অনুরূপ চিন্তাই পোষণ করেছিলেন বাবা। কিন্তু মেঘনাদ পড়াশোনা বন্ধ করতে চাইলেন না। পড়ার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে বাবা তাঁকে ভর্তি করিয়ে দিলেন বাড়ী থেকে সাত মাইল দূরে একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে।

প্রতিদিন সাত মাইল পথ হেঁটে, রোদ-ঝড়-জল মাথায় করে বালক মেঘনাদকে স্কুলে যেতে হতো এবং ফিরে আসতেও হতো। সে পথ আবার আজকের পিচ বাঁধানো রাজপথ ছিল না। গরমের সময় ধুলো এবং বর্ষার দিনে হাঁটু সমান কাদাকে ভেঙ্গে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হতো। তাতে বালকের কোন দুঃখ ছিল না, কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করতেন না, বা কোন অভিযোগও ছিল না। উপরের খোলা আকাশ আর চারপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে করতে পথ হাঁটতেন।

বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে যেতো বালকের। দিনের সূর্য ও রাত্রে আকাশের চন্দ্র ও তারকাগুলি তাঁর মনকে বুঝি নাড়া। দিতো। হয়ত বা মনে ভাবতো জ্যোতিষ্কদের কথা। ভাবতো আকাশের ঐ সূর্যটাই বা কী? এত তেজ তার দেহে এলো কেমন করে? আর তাঁর সেই বাল্যের ভাবনার মধ্যেই নিহিত হয়েছিল ভবিষ্যতের বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন।

এত পরিশ্রম করে তাঁকে প্রতিদিন পড়তে যেতে হতো বটে, তবে পড়ার সময়টা কিন্তু নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। ভোরের অনেক আগেই শয্যা ত্যাগ করতেন এবং বসে যেতেন পড়াশোনা করতে। প্রয়োজন হলে তাঁকে দোকানেও যেতে হতো এবং খরিদ-দারদের সামলাতে হতো।

এত পরিশ্রম কিন্তু ব্যর্থ হলো না মেঘনাদের। মধ্য ইংরাজী পরীক্ষায় ঢাকা জেলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে লাভ করলেন বৃত্তি। বালকের কৃতিত্ব দেখে সবাই হলেন মুগ্ধ।

এতদিনে মেঘনাদের উচ্চশিক্ষার পথ হলো সুগম। ভর্তি হলেন ঢাকার নামকরা কলেজিয়েট স্কুলে। বিনা বেতনে যেমন পড়ার সুযোগ পেলেন তেমনই বৃত্তির টাকায় ছাত্রাবাসে থাকতেও অসুবিধা হলো না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইখানে পাঠকালে

রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ায় বিদ্যালয়ে পাঠ হলো নিষিদ্ধ এবং বৃত্তিটিও কাটা গেল।

উক্ত ঘটনার পর মেঘনাদ কিন্তু দমলেন না বা পড়াশোনার উদগ্র নেশাকে পরিত্যাগ করলেন না। নানা বেসরকারী স্কুলে চেষ্টা করতে লাগলেন পড়াশোনার জন্য। কিন্তু রাজরোষ যাঁর উপরে তাঁকে বিদ্যালয়ে স্থান দিয়ে কেইবা বিপদকে ডেকে আনতে চায়? কে চায় জেনে শুনে কালসাপকে ঘরে ডেকে আনতে? তাই বালক মেঘনাদ যেখানেই গেলেন, সেখানকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শুধু শিউরে উঠলেন না, সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিলেন স্কুলের ত্রিসীমানা থেকে।

তবু হাল ছাড়লেন না বালক মেঘনাদ। প্রচেষ্টা চালিয়েই গেলেন। অবশেষে উপস্থিত হলেন কিশোরীলাল জুবিলী হাই-স্কুলে।

এখানকার প্রধান শিক্ষক মশাই ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতেন না বটে কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গকে সমর্থন করতেন না। অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ছিলেন, এবং স্বাজাত্যবোধও ছিল প্রবল। এমন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে চাইলেন না। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ও রাশভারি সেই মানুষটি মেঘনাদের পড়ার সমূহ সুযোগ করে দিলেন। বেতন একেবারে মকুব করে দিলেন এবং খাওয়া ও থাকার জন্য ঠিক করে দিলেন একটা ভাল বাসা।

এরপর লেখাপড়ায় মেঘনাদের আর কোন অসুবিধা হয় নি। কৃতিত্বের সঙ্গে বৃত্তি লাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রধান শিক্ষক মশাইয়ের মুখও রক্ষা করেছিলেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডাঃ মেঘনাদ সাহা একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। ইনিই প্রথম বিজ্ঞানী—যিনি সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সূর্যদেহে পার্থিব বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন। এই

আবিষ্কারটির জন্য সম্ভব হয়েছে বিশ্বের পরিচয় উদ্ঘাটন এবং পৃথিবীর উৎপত্তি রহস্য ব্যাখ্যা। অনেকের মতে নিউটনের পরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে যত বড় আবিষ্কার হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান এই আবিষ্কারটি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব স্তরগুলিকে নিয়েও তিনি গবেষণা করেছিলেন এবং এক্ষেত্রেও রাখতে পেরেছেন মূল্যবান অবদান। রামায়ণের সেই মেঘনাদের মত ইনি পৃথিবীর ঊর্ধ্বেই যেন বিচরণ করে গেছেন।

এক দরিদ্রের সন্তান হয়েও আপন অধ্যবসায়ের গুণে এত বড় বিজ্ঞানী হওয়ার কৃতিত্ব পৃথিবীর কম জনেরই হয়েছে।



প্রবাদ পুরুষ সত্যেন্দ্রনাথের ছেলেবেলা

এক ছিল ভারি আমুদে ছেলে। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে, খেলাধুলা করতে, হাসি তামাসা করতে তার জুড়ি নেই। শুধু কী তাই! পাশাপাশি যত সমিতি, পাঠাগার ইত্যাদি আছে সেখানেও যাওয়া চাই।

বালকের মনটাও ছিল বড় সরল। ছোট বড় সবার সঙ্গে মিশতে পারে, গরীব যারা তাদের সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আবার জনহিতকর কোন কাজ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারাটা দিন ব্যস্ত থাকে কোন না কোন কাজে।

বালকের যখন দশ-এগার বছর বয়স তখনই বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে-সোচ্চার হয়ে উঠে কলিকাতা। এখানে সেখানে স্থাপিত হয় নানা অনুশীলন সমিতি। সেই বয়সেই বালকটির মন বিষিয়ে ওঠে শাসক ইংরাজদের প্রতি। তাই একটি অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়েও শুরু করে দেয় কাজ।

বেজায় হাসিখুশি হওয়ার জন্য বালকটিকে সবাই ভালবাসতো। সঙ্গ লাভের জন্যও কামনা করতো সহপাঠী এবং সমবয়সীরা। বালক অম্লান বদনে সবার সঙ্গে আড্ডা দিতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

একটা ব্যাপারে কিন্তু সবাই আশ্চর্য্যবোধ করতো। যারা সাধারণত আড্ডা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সভা-সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকে, খেলাধুলায় মত্ত থাকে তারা লেখাপড়ার বেলায় খুব একটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে না। অথচ এই বালকটি সম্পূর্ণ বিপরীত। ক্লাসে কখনও সে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হতো না। কেবল তাই নয়, পরীক্ষার খাতায় যে নম্বর পেতো তার ধারে পাশে যাওয়ার সাধ্যও ছিল না কারুর।

সহপাঠীদের কাছে বালকটি ছিল তাই মূর্তিমান বিস্ময়। তারা কোন কোন সময় পরীক্ষা করতে চাইতো, পরীক্ষার সময় ইচ্ছে করে সারা বেলা গল্প জুড়ে দিতো কিংবা কোন কাজের ভার দিয়ে দিতো। তথাপি পরীক্ষার খাতায় নম্বর কমতো না।

খুব ভাল অংক জানতো বালকটি, কিন্তু তাকে অংক কষতে কেউ দেখতো না। পরীক্ষায় সব সময় অংকে ১০০ এর মধ্যে ১০০ই পেতো। একবার ক্লাসের এক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বেশ কিছু দুরূহ অংক এসেছিল। বালক ওতেও অসুবিধা বোধ করেনি। তার অংকে গভীর জ্ঞান দেখে বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক ১০০ নম্বরে ১১০ নম্বর দিয়ে বসেছিলেন।

এই ব্যাপারে গণিত শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—আমি খুশি হয়ে নম্বর দিয়েছি। ও ছেলে বড় হলে বিরাট এক গণিতজ্ঞ হবে এবং পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের মর্যাদা লাভ করবে।

সেদিনের সেই গণিত শিক্ষকের কথা কিন্তু মিথ্যে হয়নি। এই বালককেই উত্তরকালে ম্যাক্সপ্লাংক ও আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানে বিরল প্রতিভাধরদের মতবাদকে গাণিতিক পদ্ধতিতে সংশোধন করে বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন। এই বালকটি আর কেউ নয়, আধুনিক পদার্থ বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ "বসু সংখ্যায়ণের" প্রবক্তা আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন খুবই গৌরবময়। অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন তিনি। পড়াশোনা করেন বাড়ীর পাশে নিউ ইণ্ডিয়া স্কুলে। তাঁর প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হতেন শিক্ষক মশাইরা। যেন এক বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন তাঁরা।

সত্যেন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন হিন্দু স্কুল থেকে। কথিত আছে, দশম শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এক বছরের জন্য পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর তিনি ভর্তি হন হিন্দু স্কুলে। জীবনে এই প্রথম বার তিনি প্রথম হতে পারেন নি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অধিকার করেছিলেন পঞ্চম স্থান।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কিশোর সত্যেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর বরাবর এবং গণিতে প্রতিভা ছিল অনন্য সাধারণ। তাই আই. এস. সি. পড়তে শুরু করেন এবং উক্ত পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মেধাবী ছাত্র—এঁরা সবাই উত্তর কালে পৃথিবীর প্রথম সারির বিজ্ঞানী রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। অথচ সত্যেন্দ্রনাথকে কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি।

বি. এস-সি. পড়াকালে ঢাকা থেকে মেঘনাদ সাহাও এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনিও পারেননি বি.এস-সি. ও এম. এস-সি-তে প্রথম স্থান অধিকার করতে।

সত্যেন্দ্রনাথ সত্যই এক বিরল প্রতিভা, তাঁর প্রতিভা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। জাতির উন্নয়নমূলক কর্মেও নিয়োজিত হয়েছিল। আর ইনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।



এডিসনের ছেলেবেলা

এক যে ছিল দামাল ছেলে। নাম তার টম।

পাঁচ বছর বয়স হতে না হতে টম বেজায় দুষ্টু হয়ে উঠেছে। সবসময় যেন খই ফুটছে মুখে।

মা সময় পেলে টমকে নিয়ে বসেন। চেষ্টা করেন একটু লেখা-পড়া শেখাতে। কিন্তু টম কী সহজে বসতে চায়? জোর করে কাছে বসিয়ে ছবির বইটা পেতে ধরলে অমনি রাজ্যের যত প্রশ্ন উথলে উঠে তার মুখে।

"ওটা কিসের ছবি মা?" মা হয়ত উত্তর দিতে শুরু করবেন, ঠিক তখনই আর এক প্রশ্ন—বইটা কোথা থেকে এনেছো মা? কে ওকে বানিয়েছে মা? তুমি?

একটু পরেই মা নাজেহাল হয়ে ওঠেন। একসময় ছেড়ে দেন টমকে। আর টম! উচ্চিংড়ে-ফড়িংদের মত লাফাতে লাফাতে, ভোরের ফিঙে-বুলবুলদের মত কল কল করতে করতে যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে টমের দুষ্টুমি আরও বেড়ে ওঠে। এরই ভেতরে রাজ্যের যত বাজে আর ভাঙ্গাচোরা জিনিসকে হাতের

কাছে মজুত করেছে, সারাটা দিন এখানে-ওখানে ঘুরঘুর করছে, নয়ত তার সাধের জিনিসপত্তরগুলোকে সামনে পেতে ঠুকঠাক, ঘুটঘাট করতেই আছে। কেবল ঘুমানোর সময়টুকু ছাড়া তার হাত দুটো আর মুখের বিরাম থাকে না কোন সময়।

বড়লোকও তারা ছিল না। এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ঘর-সংসারের কত যে জিনিসপত্তর ভাঙ্গতো তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না। জিনিসপত্তরকে যেখানেই সরিয়ে রাখা হোক না কেন তার বাজপাখীর চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় ছিল না। সেই পিঁপড়ে কিংবা মৌমাছিদের মত সবকিছুই যেন ধরা পড়তো তার কাছে। আর হাতে পড়লে তো রক্ষে নেই! ভেতরে কী আছে, কেন অমন দেখাচ্ছে—দেখতে গিয়েই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলা!

ক্ষতির পরিমাণ দেখে মায়ের তো গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হতো মাঝে-মাঝে। কখনও বকতেন, কখনও শাসন করতে যেতেন, আবার কখনও টমের সঙ্গে আড়ি করতেন।

টম কিন্তু ওসবের কিছুই বুঝতে পারতো না। কেবল বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো মায়ের মুখের পানে।

অপরাধীর মত টমকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে মায়ের রাগটা নিমেষে যেন জল হয়ে যেতো। মনটা কেমন যেন হু হু করে উঠতো। টম আবার একটু রোগাসোগা ধরণের ছিল, তার উপর তাঁর ছোট ছেলে। তাই যত না রাগ করতেন, তার চেয়ে বেশী করতেন আদর। ভালটা, মন্দটা টমকে বেশী করে খাওয়াতেন। ভাল না খাওয়ালে শরীর ভাল হবে কেমন করে?

একদিনের কথা! টম দেখলে, ঝুড়ির ভেতরে একটা মুরগী বুক চেপে দিব্যি শুয়ে আছে। কোঁক কোঁক করে ঘুরছে না, ঠুকরে ঠুকরে খাবার খাচ্ছে না, এমনকি নড়ছেও না। খু-উ-ব মজা পেলো

টম। হাত দুটো তার নিশপিস করতে লাগলো মুরগটাকে ধরার জন্য!

কিন্তু এ কী অবাক কাণ্ড। দু-পা এগুতেই পালক ফুলিয়ে এবং ঠোঁট দুটো ফাঁক করে বাজখাঁই গলায় কোঁ-র্-র্-র্ কোঁর-কোঁর করে উঠলো। লাল লাল চোখ থেকে যেন আগুন ঝরাতে ঝরাতে বললে—অ্যাই, খবরদার। কাছে ভিড়েছো কী তোমার একদিন নয়ত আমার একদিন।

টম আর কী করে! হাত দুটো গুটিয়ে চুপচাপ দাঁড়াতে হলো তাকে। কিন্তু চোখদুটোতো তার খোলা! এক সময় নজরে এলো, মুরগীর পেটের তলায় ডিম রয়েছে। কিন্তু কেন? কেন ডিম চেপে পড়ে আছে অমন করে?

একটুও দেরি না করে টম ছুটে গেল মায়ের কাছে। গোল গোল চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো—দেখবে এসো মা, এত্তগুলো ডিম!

মা ভাবলেন, টম যাইহোক একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে এসেছে। অগত্যা যেতে হলো টমের সঙ্গে। দেখলেন, মুরগী এবং ডিম দুইই ঠিকঠাক আছে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পই পই করে বোঝালেন টমকে। বললেন—খবরদার, কাছে যাসনে যেন? চোখ ঠুকরে কানা করে ছাড়বে।

টম জিজ্ঞাসা করলো—মুরগীটা অমন চুপচাপ ডিম চেপে বসে কেন মা?

মা সহজভাবে বললেন—ডিমে তা দিচ্ছে যে! দেখবি, একদিন ডিম ফুটে কেমন চমৎকার সব বাচ্চা বেরুবে!

টম মায়ের বাধ্য ছেলের মত মুরগীকে আর কিচ্ছুটি বললে না। শুধু দিনে দশবার করে মুরগীটার চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করলো।

ডিম ফুটলো একদিন। টমের আনন্দ আর দেখে কে? গোল গোল বাচ্চাগুলো এন্তার ছুটে বেড়ায়, কিচকিচ করে, নয়ত ঘুরঘুর করে মায়ের চার পাশে। ভারি মজা পায় টম। ধরতেও চায় সে। কিন্তু মুরগীটা যা—রাগী! টমকে কাছে দেখলেই রাগে পালক ফুলিয়ে গরগর করতে থাকে, আর বাচ্চাগুলো অমনি সটান লুকিয়ে পড়ে পালকের তলায়।

মনের দুঃখ মনে চেপে চুপচাপ থাকে টম। একদিন রান্নাঘরে কয়েকটা ডিম দেখে তড়াক্ করে এক বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। মাকে লুকিয়ে ডিমগুলো নিয়ে চুপচাপ সরে পড়লো। তারপর নিরালা এক ঘরের কোণে ঝুড়ির উপর ডিমগুলো পেতে দিয়ে আচ্ছা করে চেপে বসলো। ভাবখানা, ডিম ফুটিয়ে মাকে সে একেবারে চমকে দেবে আর কয়েকটা মুরগীর বাচ্চাকে খেলার সাথী করে নেবে।

সকাল থেকে টমের দেখা না পেয়ে মা তো অবাক! কত ডাকাডাকি করলেন, তবুও সাড়া পেলেন না। কতজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কোন হদিস দিতে পারলো না। শেষে বিস্তর খোঁজা-খুঁজির পর তাকে পাওয়া গেল ঘরের কোণে। একেবারে ভাল মানুষের মত চুপচাপ বসে থাকতে দেখে মা রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তুই ওখানে একা একা বসে কেনরে টম?

গলা ঘাটো করে টম জবাব দিলে—তুমি চুপ কর মা, আমি ডিম ফোটাচ্ছি।

—ডিম ফোটাচ্ছ? মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন—উঠে আয়তো দেখি?

—উঁ হুঁ, একটুও নড়া চলবে না। ডিম ফুটবে না তাহলে।

টম যখন কিছুতেই উঠতে চাইলো না, তখন মা জোর করে তাকে

টেনে তুললেন। কিন্তু এ কী? ঝুড়ির উপরে পড়ে রয়েছে কতকগুলো সাদা ডিমের খোসা। ডিমের লালায় আর কুসুমে টমের জামাপ্যান্ট থেকে ঝুড়ি—একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।

রান্না ঘরে গিয়ে দেখেন, যা ভেবেছেন—তাই। একটিও ডিম নেই। অভাবের সংসার! মার গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো যেন!

এত ক্ষতি সহ্য করতেন, তবু মা টমকে বড় একটা বকাঝকা করতেন না। তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়েছিল, এ ছেলে বড় হলে মানুষের মত মানুষ হবে। সব ক্ষতি মেনে নিতেন, সব অত্যাচর সহ্য করতেন। আর কৃপণের ধনের মত, পাখী মায়ের ছানার মত, গাছের গায়ে লতার মত আগলে রাখতেন সবসময়। এবং চেষ্টা করতেন এক-আধটু লেখাপড়া শেখাতে।

মা খু-উ-ব উচ্চ আশা পোষণ করতেন বলেই টমকে একটু কম বয়সে ইস্কুলে যেতে হয়েছিল। আর এই ইস্কুলেই যাওয়াটাই কাল হয়েছিল টমের। সে এক বেদনামাখা কাহিনী।

ইস্কুল কামাই করতো না টম। যাওয়ার পথে চারপাশের দৃশ্যগুলোকে যেন গিলতে গিলতে যেতো সে। কত হরেক রকমের ঘরবাড়ী, কত বিচিত্র ধরণের মানুষ, কত গাছপালা, পশুপাখী, কীটপতঙ্গ। সবার কথা জানতে তার বড় সাধ। আকাশের নীলিমাকে যেন শোষণ করে নিতে চায়, প্রকৃতির বুকে যেন হারিয়ে যেতে চায়, ফুলের মাধুরীতে বাঁধা পড়তে চায়। তাই হাজারে হাজারে প্রশ্ন এসে ভিড় করে তার মাথায়—বুঝিবা আগুন ধরিয়ে দেয়। সে আগুনকে নেভানোর ক্ষমতা বাবা-মা কারও ছিল না —এমন কি মাষ্টার মশাইদেরও নয়।

টমের কৌতূহল একবার জাগলে সহজে প্রশমিতও হতো না। ঝুড়ি ঝুড়ি প্রশ্ন রাখতো মাষ্টার মশাইদের সামনে। আর সেসব

কী জটিল প্রশ্ন ! মানুষ কথা বলতে পারে, পশুপাখীরা কেন পারে না ? আকাশটা নীল কেন, গাছের পাতা সবুজ কেন ? আপেল গাছে কেন আঙুর ফলে না, মুরগীর ডিম থেকে কেন হাঁসের বাচ্চা হয় না—এমনতরো আরও কত প্রশ্ন ! প্রশ্নের সীমাও ছিল না, শেষও ছিল না।

টমের প্রশ্ন শুনতে শুনতে কয়েক মাসের ভেতরেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন মাষ্টারমশাইরা। তাঁরা ধরে নিলেন, ছেলেটা যাকে বলে একেবারে এঁচোড়ে পাকা। বখাটে এবং বেয়াদব। জীবনে ওকে দিয়ে যে কিছুটি হবে না এমনও মনোভাব প্রকাশ করলেন সবাই। তাই এবার থেকে টমের মুখে প্রশ্ন শুনলেই তাঁরা তেড়ে আসতেন, ছেলেদের সামনে অপমান করাতেন, মারধোর করতেন। টম কিন্তু মাষ্টার মশাইদের রাগের কারণ বুঝতে পারতো না। তাই ফ্যাল-ফ্যাল করে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো, ছল ছল চোখে মারধোর সহ্য করে যেতো, তবু প্রশ্নের রাশকে টেনে ধরতে সে ভুলে যেতো এবং ইস্কুলও কামাই করতো না।

সেদিন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন এক মাষ্টারমশাই। মেজাজটা তাঁর বোধ হয় সেদিন ভাল ছিল না। পড়ানোর মাঝখানে যেই টম একটি প্রশ্ন করে বসলো—অমনি তাঁর মেজাজটা খাপ্পা হয়ে উঠলো। কটমট করে একবার তাকালেন টমের দিকে। তারপর উঠে এসে টমের গালে লাগিয়ে দিলেন ঠাস করে এক চড়।

বেচারা টম ! মাথা ঘুরে পড়ে গেল সেইখানেই। তারপর বাড়ীতে নিয়ে আসা হলো টমকে। চিকিৎসাও করতে হলো। শেষে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠলো তখন দেখা গেল, সে আর ভালভাবে কানে শুনতে পাচ্ছে না।

মা বেজায় দুঃখিত হলেন। খুব করে কাঁদালেনও। এবার থেকে তিনি আর টমকে ইস্কুলে পাঠালেন না। টমকে চলনসই

গোছের লেখাপড়া শেখাতে এবং তাঁর প্রশ্নগুলোর সমাধান করতে নিজেই উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ফল কিন্তু ভালই হলো। খুব কম সময়ের ভেতরেই অনেক এগিয়ে গেল টম। কিন্তু কানে খাটো থেকে গেল তেমনই।

এই বালক আর কেউ নয়, বিজ্ঞানের যাদুকর টমাস আলভা এডিসন। এর মত এত বেশী আবিস্কার কোন বিজ্ঞানী করতে পারেন নি। এক মাত্র জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহলই তাঁকে এনে দিয়েছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ট আবিষ্কারকের গৌরব। অথচ কোন ইস্কুলে বা কলেজে পড়েননি তিনি। ছেলেবেলায় একমাত্র টমের মা ছাড়া কেউ বুঝতে পারেনি যে টম এত বড় হবে।

এডিসনের আবিষ্কারের কোন তুলনাই হয় না। আধুনিক সভ্যতার মান উন্নয়নে তাঁর দান অপরিসীম। সিনেমা, বৈদ্যুতিক বাল্ব, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেলিগ্রাফের ট্রানস্‌মিটার—সবই তাঁর অবদান। কথিত আছে, তিনি যাকে নিয়ে এক-আধটু ভাবনাচিন্তা করতেন—অচিরেই তার অনুকরণ করতে গিয়ে খাড়া করে ফেলতেন এক যন্ত্র। বয়সকালে নিজের বধিরতাকেও ঢেকে দিয়েছিলেন যন্ত্রে। তাই তাঁর আবিষ্কারের সংখ্যা এত বেশী যে সবগুলোকে একত্রিত করলে বিরাট এক তালিকা তৈরি হয়ে যাবে।

এডিসনের ছেলেবেলার কাহিনী রূপকথার গল্পকেও বুঝি হার মানায়। বছর বারো যখন বয়স অভাব-অনটনের সংসারকে সাহায্য করতে রুজি রোজগারে মন দিয়েছিলেন। জীবন শুরু করেছিলেন এক ফেরিওয়ালা হিসেবে। রেলগাড়ীর কামরায় কামরায় খবরের কাগজ ফেরি করতেন। তারপর ইস্টিশানে ফেলে দেওয়া পুরাতন এক বগিতে ছাপাখানা বসিয়ে নিজেই খবর সংগ্রহ করতেন, নিজে ছাপাতেন এবং ফেরিও করতেন নিজে।

সেই সময় এক বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল তাঁর জীবনে। একদিন খবরের কাগজ ফেরি করার সময় দেখতে পেলেন, একটা ছোট্ট ছেলে

অতি ধীর পায়ে রেললাইনের উপর দিয়ে হাঁটছে। আর তার সামনে এসে পড়েছে দৈত্যের মত রেলগাড়ী একটা।

ইস্টিশানে যারাই দাঁড়িয়েছিল, তারা একবাক্যে চিৎকার জুড়ে দিলো—গেল, গেল, ছেলেটা গেল। কিন্তু কেউ এগিয়ে গেলনা ছেলেটাকে টেনে আনতে।

বালক এডিসন খবরের কাগজ বগলে করে আপন মনে হেঁকে চলেছেন—চাই, খবরের কাগজ, খবরের কাগজ চাই!

হঠাৎ লোকজনের চিৎকার চেঁচামেচিতে ফিরে তাকালেন রেল লাইনের দিকে। যা দেখলেন, তাতে তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছেলেটির উপরে। কোন রকমে ছেলেটিকে টেনে নিয়েছেন—এমন সময় হুস হুস করে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে রেলগাড়ী এসে পড়লো।

সেই ছোট্ট ছেলেটি ছিল সেখানকার স্টেশনমাষ্টারেরই ছেলে। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে আপন পুত্রকে ছিনিয়ে আনায় কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক এডিসনকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। সে চাকরিটা ছিল কাছের এক টেলিগ্রাফের অফিসে। টরে-টক্কার মাধ্যমে যে খবরগুলো আসতো তাদেরই ধরতে হতো এডিসনকে।

এডিসন খুশিই হলেন। একদিন ভাবলেন, ঐ টরে-টক্কাগুলোকে নিজে না ধরে যন্ত্র দিয়ে ধরলে কেমন হয়?

ব্যস্! কয়েকদিনের ভেতরেই বানিয়ে ফেললেন যন্ত্র। এবার থেকে তাঁকে আর খবরের আশায় বসে থাকতে হলো না। খবর এলেই তাঁর নতুন যন্ত্রের কাগজে ছাপ ফেলে দিল। আর বালক এডিসন অবসর পেয়ে নিজের উদ্ভট উদ্ভট পরিকল্পনাগুলোকে রূপ দিতে এগিয়ে এলেন।

এবারও ঘটলো এক অঘটন। এডিসনের অজান্তে একদিন

বিগড়ে গেল যন্ত্রটা। সকালে দেখেন, আগের দিনের একটিও খবর ধরা পড়েনি। এবার রীতিমত মাথায় হাত দিলেন এডিসন।

কিন্তু ওপরওয়ালারা ছাড়বেন কেন? কাজে ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে এডিসনকে তাড়িয়ে দিলেন অফিস থেকে। একটা কাণা-কড়িও দিলেন না। যে বেতনটা বাকি ছিল তাও জরিমানা হিসেবে কেটে নিলেন।

বালক এডিসন বড্ড বেকায়দায় পড়লেন এবার! হাতে একটিও পয়সা নেই। যা বেতন পেতেন তার সবটাই আজে বাজে জিনিসে ব্যয় করতেন। চোখে সরষের ফুল দেখলেন যেন!

বালক এডিসনের সে এক চরম দুঃসময়। চাকরির খোঁজে শহরে গিয়েও কোন সুবিধা করতে পারলেন না। পয়সাকড়ি হাতে যা ছিল তাও খরচ হয়ে গেল। শেষে এমন হলো যে, একরকম উপোসেই দিন কাটাতে হলো। ক্ষিদে পেলে কলের জল খান, রাতে এক বন্ধুর কাছে ঘুমান আর সারাটা দিন টো টো করে ঘুরে বেড়ান চাকরির খোঁজে।

একদিন খবর পেলেন, শহরের এক নামকরা কারখানার বড় টেলিগ্রাফের যন্ত্রটি বিগড়ে গেছে। শহরে যত ভাল ভাল মিস্তিরি ছিলেন—সবাইকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু কেউ সারাতে পারেননি। কারখানার মালিক কারখানা বন্ধ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।

এডিসন একটুও দেরি না করে ছুটলেন মালিকের কাছে। মালিককে বললেন—শুনলাম, আপনার টেলিগ্রামের মেসিনটা খারাপ হয়ে গেছে। দয়া করে আমাকে একটু দেখাবেন?

আধময়লা পোষাক আর উস্কো খুস্কো চেহারার এক বালকের কথা শুনে অবাক বড় কম হলেন না মালিক ভদ্রলোকটি। হয়ত অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন মনে মনে। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি

কী টেলিগ্রাফের কাজটাজ জানো? বালক অতি বিনয় সহকারে বললেন—এক আধটু করতাম। দেখি, সারাতে পারি কিনা!

বালকের গলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সুর শুনে ভদ্রলোক এবার ভাল করে তাকালেন ছেলেটির পানে। একবার ভাবলেন, কত ভাল ভাল কারিগর হিমসিম খেয়ে গেল—আর এতো একজন সামান্য বালক মাত্র! একী পারবে? পুনরায় ভাবলেন, কত জনকেই তো দেখিয়েছেন। একে দেখাতে আপত্তি কোথায়? ছোট্ট বলে কী ফেলনা? ছোট্ট ছোট্ট উইপোকা পাহাড়ের মত ঢিবি বানাতে পারে, ছোট্ট একটা পাখী মহাসাগরও পাড়ি দিতে পারে, এমনকি অতি ছোট্ট যে জীবাণু একটা হাতীকেও নাজেহাল করতে পারে। তাহলে?

ভদ্রলোক এবার আসন ছেড়ে উঠলেন এবং এডিসনকে নিয়ে গেলেন কারখানার ভেতরে। বিকল হওয়া মেসিনটিকেও দেখিয়ে দিলেন।

এডিসন তাঁর রঞ্জন রশ্মির মত দৃষ্টিটাকে একবার মাত্র নিবদ্ধ করলেন মেসিনটার দিকে। তারপর কাছে গিয়ে একটুখানি খুটখাট করলেন। অবাক কাণ্ড! তক্ষুণি চালু হয়ে গেল মেসিনটা।

ভদ্রলোক নিজের চোখটাকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। একটা কৃতজ্ঞতার ভাষাও ফুটলো না মুখে। পরম আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এডিসনকে।

এরপর আর এডিসনকে ভাবতে হয়নি। ভদ্রলোক তাঁকে শুধু পুরস্কৃত করেননি, ভাল একটা চাকরিও দিয়েছিলেন কারখানায়। আর সেই থেকে একের পর এক আবিষ্কার লাভ করে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগুতে থাকে বিজ্ঞান। লেখাপড়া বেশী না শিখেও যদি চোখদুটোকে ভালভাবে খুলে রাখা যায় এবং জিজ্ঞাসা ও

কৌতূহলকে চরিতার্থ করার নেশা প্রবল থাকে, তাহলেও যে বিজ্ঞানী হওয়া যায়—তার একটা বড় প্রমাণ এডিসন।

এডিসন অবশ্য ভয়ানক বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁরই সময়ে একবার প্রশ্ন উঠেছিল "বর্তমান সময়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি কে?" জনগণ একবাক্যে প্রস্তাব করেছিলেন এডিসনের নাম। এডিসন মানুষের সভ্যতাটাকে কতদূরে যে এগিয়ে দিয়ে গেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় লোডশেডিং এর সময়ে। বৈদ্যুতিক বাতি যদি তিনি উপহার না দিতেন তাহলে কী এতখানি উন্নতি করতে পারতাম আমরা?

হেনরি ফোর্ডের ছেলেবেলা

বছর দশকের এক ছেলে—নাম তার হেনরি।

পড়াশোনায় হেনরি আদৌ মন বসাতে পারে না। কেমন যেন উড়ু উড়ু মন। মনের সবটাই দখল করে রেখেছে সেই সেকালের তিন চাকার গাড়িগুলো—যারা গাঢ় কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এবং বিকট আওয়াজ তুলতে তুলতে এগিয়ে যায়, কেবল তারাই।

শুধু কী তাই! যেখানেই মেশিন—সেখানেই মন। ঘড় ঘড় করতে করতে গাড়ী ছোটে, ভক ভক করে জল তোলে, টিক টিক করে ঘড়ির কাঁটা ঘোরে, ভারি মজা পায় হেনরি। সবকিছু ভুলে হাঁ করে শুধু তাকিয়ে থাকে।

বাবা বকেন। জিজ্ঞাসা করেন—তুই অমন হাঁ করে কী দেখিস বলতো! হেনরি তার মনের কথা বুঝিয়ে বলতে পারে না। শুধু উদাস নয়নে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বুঝিবা ভাবে, হায়রে হায়! আমার যদি এমনি একটা গাড়ী বা জল তোলা মেশিন থাকতো, তাহলে কী মজাই না হতো।

লেখাপড়ায় অমনযোগী হওয়ার জন্য বাবা রাগ করেন। কখনও বা শাসন করতে এগিয়ে আসেন। মা বাধা দেন। বলেন—হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো আর সমান নয়! একজন না হয় ভালভাবে পড়াশুনা নাইবা করলো। ঘরে থাকবে, খেত-খামার দেখাশুনা করবে, ওতেই চলে যাবে দিনগুলো। তার চেয়ে ওকে একসেট ছুতোর মিস্ত্রিরির যন্তর কিনে দাও। ওর হাতটা খুব ভালো কিনা!

হেনরিকে কাছে ডেকে মা জিজ্ঞাসা করেন—পড়াশোনা তো করলি না! বড় হলে তুই কী করবিরে হেনরি!

হেনরি বুক ফুলিয়ে এক নিঃশ্বাসে বলে যায়—যন্তর বানাবো, গাড়ী বানাবো আর মেশিন চালাবো। তুমি আমায় একটা মেশিন কিনে দাও না মা!

মা হাসেন। বলেন—তুই বড় হ, নিশ্চয়ই মেশিন একটা কিনে দেবো।

বাবার কিনে দেওয়া ছোট ছোট করাত, বাটালি, রাঁদা, তুরপুন পেয়ে ভারি খুশি হল হেনরি। শুরু করে কেবল গাড়ী বানাতে। সে গাড়ী, কেবল খেলনা গাড়ী। কোনটা ঘোড়ার গাড়ীর মত, কোনটা তিনচাকার মোটর গাড়ীর মত, কোনটা দু-চাকার সাই-কেলের মত.—খেলাঘরে কেবল গাড়ীরই মিছিল।

হেনরির হাত দেখে এবং অনুকরণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে মা অবাক হতেন। তবু যেন তৃপ্তি পেতেন না মনে মনে। মাঝে মাঝে বলেন—কেবল ছুতরের কাজ নিয়ে মেতে থাকলে কী চলবে রে হেনরি! একটু লেখাপড়া করতে হবে না।

হেনরি আদৌ কাণ দেয় না মায়ের কথায়। তবু ইস্কুলে তাকে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে তার মন টেঁকে না আদৌ! বইতে মন বসে না, মাষ্টার মশাইর কথা কাণে ঢোকে না, লিখতে গেলেও হাত যেন উঠে না। মাষ্টার মশাইরাও ধরে নিয়েছেন, যে হাতে করাত-বাটালি চলে সে হাতে কলম চলে না। জীবনে যে আদৌ উন্নতি হবে না একথা বার বার উল্লেখ করেন।

বাবাও মাষ্টারমশাইদের সঙ্গে একমত ছিলেন। তাই পড়া-শোনার উপর গুরুত্ব না দিয়ে খেত-খামরের কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতেও কী মন বসে! খামারে যায়, চাষ-বাস দেখা শোনার বদলে করাত চালায়, নয়ত কোন গাড়ী কিংবা মেসিন দেখলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বাবা ভাবলেন, হেনরিকে দিয়ে কিছু হবে না। একেবারে গাধারও অধম যেন।

খামারে গিয়ে হেনরি কিন্তু ভাবলো অন্য কথা। মেশিন যদি বোঝা বহে নিয়ে যেতে পারে, জল তুলতে পারে, তাহলে লাঙ্গল করা কেন যাবে না ? অথচ লাঙ্গল করায় কত ঝুঁকি আর কত ঝামেলা ! পশু দুটাকে ঠেলা লাগওরে, তাদের মর্জিতে পেছনে পা ফেলে এগোওরে, রোদ-জল-শীতে লেগে থাকরে। মেশিনের পেছনে লাঙ্গলের ফলা জুড়ে দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারলেই তো কেল্লা ফতে ! দিব্যি বাবুর মত বসে থাকো আর গাড়ীর মত চালিয়ে নিয়ে যাও। আঃ কী মজাই না হয় তাহলে।

মেসিন, মেসিন আর মেসিন—একেবারে যেন পাগল হয়ে উঠে হেনরি। কী আছে ওর ভেতরে ! কেমন করে ও গাড়ীকে টেনে নিয়ে যায় আর কেমন করেই বা সে জল তোলে গমভাঙ্গে। একবার খুলে দেখতেই হয়। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে ?

অনেক ভেবে চিন্তে হেনরি দেখলো, তার বাবারই তো একটা পকেট ঘড়ি আছে। তার ভেতরে নিশ্চয়ই ছোট্ট মেসিন আছে একটা ! তা না হলে তার কাঁটাগুলো অমন ঘুরে কেন, অমন টিকটিক আওয়াজ হয় কেন, আর সময়টা বা ঠিকঠিক বাৎলে দেয় কেমন করে।

কিন্তু ঘড়িটা কেমন করে সরানো যায় ? বাবা-যা রাগী তাতে ঘড়িটা চাওয়াও যায় না। আর এমন সাবধানী যে, সব সময় কাছে কাছে রাখেন। তাহলে কী হাতে পাওয়া যাবে না ঘড়িটা !

ঘড়িটা হাতাবার সুযোগ খোঁজে হেনরি। একদিন সত্য সত্যই এসে গেল সুযোগ। বাবা ঘরে নেই, অথচ ঘড়িটা পড়ে আছে টেবিলে। মাও ঘরের কাজে ব্যস্ত। ঘড়িটা মুঠোয় পুরে সটান সরে পড়লো হেনরি। তারপর ঘরে গিয়ে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। কিন্তু খোলা যাবে কেমন করে ?

একসময় তার ধারণা হলো, ঐ পেছনের দিকটা দিয়ে খুলতে

হবে। একটু টানাটানিও করলো, আর তখনই পেছনের একটা চাকতি খুলে গেল। কিন্তু এ যে একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! গাদা গাদা ছোট ছোট স্ক্রু দিয়ে সাঁটা আছে যন্ত্রগুলো! এত ছোট স্ক্রুকে খোলা যাবে কেমন করে ?

অনেকক্ষণ ভাবনার পর একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। মায়ের সেলাইর বাক্সে তো অনেক ছোট বড় সুচ আছে। তাদের একটাকে পছন্দ করে মাথাটা পিটিয়ে নিলে তো পাতলা হয়ে যাবে! তখন স্ক্রু খুলতে অসুবিধাটা কোথায়? আর হাতুড়ি যখন আছে তখন পিটিয়ে পাত করতেই বা কতক্ষণ!

অনেকক্ষণ হেনরির কোন সাড়া না পেয়ে মা প্রথমটায় ডাকাডাকি শুরু করলেন। কোন জবাব না পেয়ে খোঁজ করতে শুরু করলেন। প্রথমেই ঢুকে পড়লেন হেনরির খেলা ঘরে। যা ভেবেছেন তাই! হেনরি তন্ময় হয়ে কী যেন ভাবছে।

হঠাৎ হেনরির হাতের দিকে লক্ষ্য পড়তেই শিউরে উঠলেন মা! একি? এযে হেনরির বাবার সেই সাধের ঘড়িটা! খাপটা তার হাতে আর সমস্ত যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে সামনে।

গালে হাত ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন হেনরির দিকে। অনেকক্ষণ পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আফসোসের সুরে বললেন—তুই কী সর্বনাশারে হেনরি! অমন একটা দামী জিনিসকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেললি।

এতক্ষণে হেনরির সম্বিৎ যেন ফিরে এলো। মুচকি হেসে বললো—তুমি কিছু ভেবো না মা, ঘড়িটাকে এক্ষুণি ঠিক আগের মত করে দিচ্ছি দেখে নিও!

মা আর কী করেন! কাঠের পুতুলের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে। বকাঝকার অভ্যাসও ছিল না তাঁর! এতবড় ক্ষতিটাকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বললেন—তোর জন্যে ঘর

সংসারের কোন জিনিস থাকবে না দেখছি! আর তুই ভিখিরী না বানিয়েও ছাড়বি না আমাদের।

মা আর দাঁড়ালেন না। ধীর পায়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। আর হেনরিও মায়ের কথার কোন জবাব না দিয়ে শুরু করে দিলো কাজ।

মা তখন ঘরের ভেতরে টুকিটাকি কাজকর্ম করছিলেন। হেনরি একসময় তীরের মত ছুটে গিয়ে মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরলো। ঘড়িটা সামনে পেতে দিয়ে বললো—কী ঠিক বলেছিলাম কিনা! দেখতো, সেই আগের মত ঘড়িটা ঠিক চলছে কিনা!

মা যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কে বলবে, এটাকে এক্ষুণি টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল!

এবারও মায়ের মুখে সহসা কথা সরলো না। হেনরি মুখটা ব্যাজার করে পুনরায় বললো—যদি ঐ যন্ত্রগুলোকে হাতে তৈরি করে নিতে পারতাম তাহলে তোমাদের সবার জন্য বানিয়ে দিতাম এক একটা করে ঘড়ি।

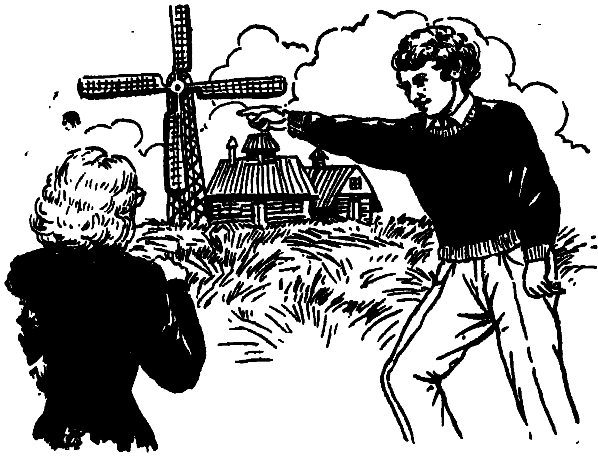
এতদিনে মায়ের বিশ্বাস হলো, হেনরি যা বলে—ঠিক তাইই করে। আর এও বুঝতে পারলেন, এমন যার সূক্ষ্ম নজর—সে ভবিষ্যতে এক বড় শিল্পী না হয়ে পারে না। আবেগে হেনরিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার চুমো খেলেন মা।

মায়ের ধারণা মিথ্যে হয়নি। এই বালকই একদিন পরিচিত হয়েছিলেন বিশ্বর শ্রেষ্ঠ কারিগর রূপে। এত পয়সা তিনি উপার্জন করেছিলেন যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনকুবের নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। নাম তাঁর হেনরি ফোর্ড।

হেনরি ফোর্ড জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও মোটর গাড়ীর উন্নতির ব্যবস্থা করে গেছেন। আগেকার সেই তিন চাকার গাড়ী—যার গতিও যেমন ছিল না, তেমনই দু-চারজনের বেশীও বহন

করতে পারতো না। হেনরি ফোর্ডই তিন চাকার গাড়ীকে মোটর গাড়ীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। যাত্রীবাহী বাস, মাল বহনের জন্য লরি, আরামের জন্য ট্যাক্সি, দুর্গম রাস্তায় চলার উপযোগী গাড়ী, লাঙ্গলের জন্য ট্রাক্টর—এ সবই তাঁর অবদান। এক কথায় মোটর গাড়ী নবজন্ম লাভ করেছিল তাঁরই হাতে। এত রকমারি গাড়ী তিনি তৈরি করেছিলেন এবং মানুষের এমন সুযোগ-সুবিধা করেছিলেন যে, তাঁর নামে একটা প্রবাদও প্রচলিত হয়েছিল। প্রবাদটি "হেনরি ফোর্ড সারা আমেরিকাকে চাকার উপর বসিয়ে দিয়ে গেছেন।"

কথাটা একেবারেই সত্য। আজকের দিনে আমরা বলতে পারি শুধু আমেরিকা নয়, সারা পৃথিবীকেই চাকার উপর বসিয়েছেন হেনরি ফোর্ড। আর এই করে তিনি নিজে কেবল প্রচুর অর্থের মালিক হননি—আমেরিকাকেও ধনী করে গেছেন।



নিউটনের ছেলেবেলা

—"ঠাকুমা, বায়ুকল দেখেছো ! বায়ুকল ?"

—"হ্যাঁ দেখেছি ।"

বালক অত্যন্ত উৎসাহের সংগে বললে—"কেমন চমৎকার, তাই না ঠাকুমা ! উপরে পাখা ঘুরছে তলায় নালা দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে, আমাদেরও যদি অমন একটা বায়ুকল থাকতো তাহলে কী মজাটাইনা হতো ঠাকুমা !"

ঠাকুমা গলায় বিষাদের সুর ঢেলে দিয়ে বললেন "একটা বায়ুকল বসাতে যে অনেক খরচ । অত টাকা কোথায় পাই বল ?"

বালক তাচ্ছিল্যের সুরে বললে—"তুমি আদৌ ভেবো না ঠাকুমা, আমি নিজেই একটা তৈরি করে ফেলবো—দেখে নিও ।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন ঠাকুমা । কিন্তু একগুঁয়ে নাতিটিকে ঠেকাতে পারলেন না । বাধ্য হয়ে তাঁকে পয়সা খরচ করে কিনে দিতে হলো জিনিসপত্তরগুলো ।

বালকটির নিজের আবার ছুতোর মিস্তিরির সাজ ছিল । ছিল ছোট করাত, বাটালি, তুরপুন আর ছিল কাঠের টুকরো, স্ক্রু, পেরেক—কত হরেক রকমের হাতিয়ার । নানাধরণের খেলনা,

টুল, চেয়ার—হামেশাই বানাতে পারতো সে। হাতটাও ছিল পাকা। ঠাকুমার কিনে দেওয়া জিনিসগুলো পেয়ে সংগে সংগেই লেগে গেল কাজে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বালক টানাটানি শুরু করলে ঠাকুমাকে।

—তুমি একবার এসো না ঠাকুমা!

—কোথায়—তাইতো বলবি!

—খামারে।

—সেখানে কী করবো গিয়ে?

—সেইখানেই বলবো। তুমি চলতো?

বালক এমন জাপটে ধরেছে যে, তাকে কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। বাধ্য হয়ে যেতে হলো খামারে।

মাঝারি ধরণের একটা খেত। তাতে যা ফসল ফলতো ঠাকুমা আর নাতির কোন রকমে চলে যেতো সারা বছর। ফসল বাড়াবার জল সেচ দেওয়ার কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। অথচ পাশাপাশি কৃষকেরা জমির পেছনে লেগে থাকেন, জল সেচের জন্য বায়ুকলের ব্যবস্থা করেছেন—আরও কত কী! খাটাখাটুনির লোক না থাকায় এবং পয়সাকড়ির টানাটানি থাকায় ঠাকুমা কিচ্ছুটি করতে পারেন নি।

আজ খামারে গিয়ে ঠাকুমা একেবারে তাজ্জব বনে গেলেন। একী! এমন চমৎকার একটা বায়ুকল তাঁদের জমিতে কোথা থেকে এলো। আকারে যদিও ছোট, তবু জল তুলছে। অবাক ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করলেন—বায়ুকল কোথা থেকে এলো রে?

ভারাক্কি গলায় বালক বললে—আমি তৈরি করেছি। কেমন, ঠিক হয়েছে তো?

ঠাকুমা বালকের নৈপুণ্য দেখে চমৎকৃত হলেন। খুব প্রশংসাও করলেন। শেষে প্রতিবেশী কৃষকদেরও ডেকে ডেকে দেখালেন।

ছোট্ট একটা বালকের এমন অদ্ভূত ক্ষমতা দেখে কৃষকেরাও রীতিমত অবাক না হয়ে পারলেন না।

এই বালকটি আর কেউ নয়, বিজ্ঞানের প্রবাদ পুরুষ স্যার আইজ্যাক নিউটন। ছেলেবেলায় বেজায় একগুঁয়ে ছিলেন তিনি। কারও সংগে মিশতেন না, কথাও বড় একটা বলতেন না কারও সংগে। লেখাপড়ায়ও তেমন আহা মরি মরি ছিলেন না। বেঁটে অথচ টিঙ টিঙে হাড্ডিসার দেহ, মোটা বুদ্ধি। আর পরিশ্রমের ধকলও সইতে পারতেন না ছেলেবেলায়। অপর দশটা সাধারণ ছেলে অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিলেন। শুধু রপ্ত করেছিলেন করাত-বাটালি ধরা এবং এতেই ছিলেন বেশ পটু। কেউ কোনদিন ভাবতে পারেনি, এ ছেলে বড় হয়ে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

নিউটনের জন্মের আগেই বাপ মারা যান। বড় দিনের দিন জন্ম হলেও আকারে ছিলেন বেজায় ছোট আর রোগা। দৈর্ঘ্যে বার-চৌদ্দ ইঞ্চির বেশি নয়। সেদিন কেউ ভাবতে পারেনি যে—এ ছেলে বাঁচবে।

তবু বেঁচে রইলেন নিউটন। মাত্র দুবছর যখন বয়স তখন তাঁর মা পুনরায় বিয়ে করে চলে গেলেন। নিউটন পড়ে রইলেন ঠাকুমার কাছে। তাঁকে বড় করেছিলেন ঠাকুমাই।

বাপ-মায়ের আদর তাই কোন দিনই লাভ করেন নি নিউটন। আর ঐ কারণেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন খিটখিটে ও অসামাজিক। একা একা থাকতে ভালবাসতেন। কোনদিন তাঁকে কেউ একটু হাসতেও দেখেনি—কাঁদতেও না। একটু খেলাধুলা, বেড়ানো কিংবা একটু শরীরচর্চা তাও না। ছেলেবেলার এই স্বভাব বড় হয়েও কাটেনি তাঁর। বরং আরও বেড়েছিল। একলব্যের সাধনা করতে গিয়ে সবকিছু ছেড়ে চার দেওয়ালের মাঝেই আটকে রেখেছিলেন নিজেকে।

রুগ্ন ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ঠাকুমা যথাসময়ে নিউটনকে ইস্কুলে পাঠিয়েছিলেন। মনে হয়, এই প্রথম ঘরের বাহিরে পা দিয়েছিলেন তিনি। আর এই প্রথম দাঁড়িয়ে ছিলেন খোলা আকাশের তলায়। বুঝিবা সেই তখনই আকাশের নীলিমা তার মনে রঙ ধরিয়েছিল, রবির কিরণ তাঁর মনের জড়তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল এবং খোলা হাওয়াটা তাঁর মনের আবিলতাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যেন জড়ের মধ্যে জেগে উঠেছিল জীবের গুণ।

সেই থেকে এক অদ্ভুত খেয়াল চেপে বসে নিউটনের মনে। দিনের বেলায় যখন আকাশে সূর্য থাকতো তখন আয়না দিয়ে সূর্যরশ্মিকে ফেলতো এখানে-সেখানে, দেওয়ালে কিংবা জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে। কখনও কখনও উঠানে আয়নাকে দাঁড় করিয়ে রাখতেন, আর আয়না থেকে ঠিকরে পড়া আলোতে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সূর্যরশ্মির রহস্যটাকে ভেদ করার প্রবণতা—সেই প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মধ্যে।

কম ঘুমানোর অভ্যাস সেই ছেলেবেলাতেই গড়ে তুলেছিলেন নিউটন। রাতের বেলায় একমনে তাকিয়ে থাকতেন তারায় ভরা আকাশের দিকে। ছোট-বড় আলোর বিন্দুগুলো মিছিল করে আকাশের এপাশ থেকে ওপাশে ধীর গতিতে যাত্রা শুরু করতো, নতুন নতুন তারার মিছিল জেগে উঠতো পূব আকাশে, হাউইর মত আগুনের ফুলকি তীরবেগে ছুটে আসতো পৃথিবীর দিকে, কখনও কখনও কাঁটার মত লেজওয়ালা এক একটা অদ্ভুত ধরণের তারা আকাশ পরিক্রমা করতো, বালক দেখতো আর অবাক হতো। বুঝিবা হারিয়ে ফেলতো নিজেকে।

প্রথম প্রথম ইস্কুলে ভাল ফল দেখাতে পারেননি নিউটন। যাকে বলে—একেবারে সাধারণ ছেলে। এমন কি যে অংকের জন্য নিউটন পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছেন—সেই অংকেও তাঁর কোন

প্রতিভা প্রকাশ পায়নি। অংক সে সময় তাঁর কাছে একটা জটিল ও বিরক্তিকর বিষয় ছিল।

বিদ্যালয়ে পাঠ করার বেশ কয়েক বছর পরেই নিউটনের প্রতিভার বিকাশ ঘটতে শুরু করে। বেজায় খেয়ালি, একরোখা এবং একগুঁয়ে হওয়ার জন্য ক্লাসে ভাল ছেলেদের টপকে যাওয়ার রোখ তাঁর চেপে যায় এক সময়। মনের কথা মনে চেপে রাখতেন এবং বাহিরে কদাচ মনের ভাবকে প্রকাশ করতেন না বলে তাঁর ঠাণ্ডা লড়াইর খবর কেউ জানতে পারলো না। ডুব দিলেন বই-র ভেতর। রাত জেগে শুধু পড়া, পড়া আর পড়া। কিছুকাল পরে তার এমন অভ্যাস গড়ে উঠলো যে, পড়া ছাড়া থাকতেই পারলেন না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্তও এ অভ্যাসটা ছিল নিউটনের।

যেহেতু অধ্যাবসায়ের বিকল্প নেই এবং জ্ঞানের পরিধিও সীমা-হীন, তাই জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দিয়ে পাকা ডুবুরির মত একে একে তুলতে শুরু করলেন মুক্তো। রাশি, রাশি—অজস্র! এবার আর কোন ছেলে দাঁড়াতে পারলে না তাঁর সামনে। যেন নির্বোধ পরিণত হল বুদ্ধিমানে, পঙ্গু হলো দ্রুত গতিসম্পন্ন, মূক হলো মুখর। সেদিনের সেই বেঁটে-খাটো, রোগা লিকলিকে ছেলেটার প্রতিভা দেখে বিস্মিত হলেন সবাই। এখন রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ শ্রেষ্ঠ এক অভিনেতার আত্মপ্রকাশ ঘটলো, আর এতকালের বড় বড় কুশিলবরা তলিয়ে গেল যবনিকার অন্তরালে।

নিউটনের বয়স যখন চৌদ্দ, তখনই তাঁর মা পুনরায় ফিরে আসেন এবং পুনরায় বিধবা হয়েই। সঙ্গে তার দ্বিতীয় পক্ষের তিন তিনটে ছেলে। মা চাইলেন নিউটন পড়াশোনা বন্ধ করে দিয়ে চাষবাস করুক। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিউটনকে বাড়ীতে আনলেনও কিন্তু বাধ সাধলেন স্বয়ং নিউটনই। মায়ের সংগে তাঁর পরিচয় ছিল না, ছোট ছোট ভাইদেরও বুঝি বরদাস্ত করা সম্ভব হল না।

তার উপর এতদিনে লেখাপড়ার যে স্বাদ পেয়েছেন—তা থেকে বঞ্চিত হতেও ইচ্ছে হলো না। তাই প্রবলভাবে বিরোধিতা করলেন মায়ের।

মা অবশ্য বেশী চাপ দিলেন না। ভেবে দেখলেন, নিউটনের যা স্বাস্থ্য তাতে কৃষিকাজ করা ওর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠবে। তার চেয়ে পড়তে চায় পড়ুক। পুনরায় পাঠিয়ে দিলেন ইস্কুলে।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিউটন ভর্তি হন লণ্ডনের ট্রিনটি কলেজে। কিছুকাল পড়াশোনা করার পর সেখানে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো কলেজ। নিউটনকে বাধ্য হয়ে ফিরতে হলো ঘরে এবং আশ্রয় নিলেন খামার বাড়ীতে।

কলেজ বন্ধ থাকলেও নিউটনের পড়াশোনা স্থগিত রইল না। একান্ত নির্জনে শুরু হলো তাঁর পড়াশোনা আর গবেষণা। সূর্যের আলোক ও মহাকর্ষ সম্বন্ধে চিন্তার বীজ এখানেই হলো উপ্ত। আঠার মাস পরে নিউটন, নিউটন হয়েই যাত্রা করলেন লণ্ডনে—পুনরায় পড়াশোনার উদ্দেশ্যে।



ডারউইনের ছেলেবেলা

এক ছিল ভাবুক ছেলে। খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপ, গল্প-গুজব আদৌ ভালবাসতো না। একা একা নিরালায় বসে কী সব ভাবতো নয়ত গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-পাখী, কীট-পতংগ ইত্যাদিকে নিয়ে মশগুল থাকতো। এদের পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতো।

পড়াশোনায় অমনযোগী হওয়ায় বাবা বকতেন, মাও রাগ করতেন। হাজার হোক দেশে তাঁদের পরিবারের সুনাম আছে, টাকা-পয়সাও আছে। বালকের বাবা নামকরা এক চিকিৎসক এবং বড়দাও। এমন একটা শিক্ষিত পরিবারের ছেলে মূর্খ হলে লোকে কী বলবে! তাই বাবা এবং দাদা উভয়েই সচেষ্ট হলেন বালককে লেখাপড়া শেখাতে।

বালকটি যে নির্বোধ ছিল তা নয়। শুধু বই-র পড়ার মধ্যে সে মনের খোরাক লাভ করতে পারতো না। প্রকৃতির নিজস্ব পাঠশালায় সে ছাত্র হতে চাইতো, ফুল-পাখীর মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইতো, গাছপালাদের সংগে মিশে একাকার হয়ে থাকতে চাইতো। যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ বলের দ্বারা চালিত হয়ে সে ছুটতো প্রকৃতির কাছে। মনে হতো, ঐ নীল নীল আকাশ, ধূসর ধরণীর

ধুলিকণা, শ্যামল তৃণক্ষেত্র ও গাছপালা, বিচিত্র ধরণের পশু পাখী-কীটপতঙ্গ সবার সঙ্গে আছে তার নাড়ির যোগ। যুগ যুগ ধরে সে যেন ওদের সংগে খেলা করে এসেছে, সুখ ও দুঃখের অংশীদার হয়েছে, আবার নতুন জীবনরসে রাঙিয়েও উঠেছে।

এসব কথা প্রকাশ করার শক্তি সেদিন তার ছিল না। পড়াশোনার তাড়না পেলে বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতো শুধু।

বাবার ইচ্ছে ছিল, বালকটি বড় হয়ে যেন চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করে। অর্থ উপার্জন এবং তাতে মানুষের সেবা উভয় কাজই হবে। মারও ইচ্ছে তাই। কিন্তু বালকের লেখাপড়ার দিকে অনীহা দেখে বিমর্ষ হলেন উভয়েই। একদিন মা জিজ্ঞাসা করলেন বালককে—হ্যাঁরে তোর এমন উদাস ভাব কেনরে? এত-কী ভাবিস তুই মনে মনে?

একটুখানি নীরবে থাকার পর বালক মাকে জিজ্ঞাসাই করে বসলে—আচ্ছা মা বলতে পারো, জগতে এত গাছপালা-পশু-পাখী কীটপতঙ্গ কোথা থেকে এসেছে?

মা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন—তুই একটা আস্ত পাগল। জানিসনে, এদের সবাইকে ঈশ্বরেই পাঠিয়েছেন জগতে। একটুখানি ভাবলে বালক। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো—আর এই মানুষ জাতটা! ওদেরও কী ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।

মা বললেন—নিশ্চয়ই।

—তাহলে কেন ওরা মানুষের মত হলো না, কেন ওরা কথা বলতে পারে না, আর কেনই বা ওরা মানুষের দয়ার উপর বেঁচে থাকে?

মা গম্ভীর হলেন। বললেন—মানুষ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রিয় জীব। ঈশ্বর নিজের মত করে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের সুবিধার জন্য পাঠিয়েছেন গাছপালা ও পশুপাখীদের।

মায়ের কথায় কিছুতেই মন ভরলো না বালকের। পাল্টা

প্রশ্ন করলেন—সবই যদি মানুষের সুবিধার জন্য, তাহলে বাঘ-সিংহ, সাপ-খোপ, বিষাক্ত পোকামাকড়—এদের কেন পাঠালেন ঈশ্বর ?

মা সহসা উত্তর দিতে পারলেন না। একটু ভেবে নিয়ে বললেন—যারা মানুষ হয়েও অন্যায় ও অবিচারের প্রশ্রয় দেয় তাদের শায়েস্তা করতেই এদের সৃষ্টি।

মায়ের উত্তরে আদৌ তৃপ্তি পায় না বালক। বরং আরও জটিল জটিল প্রশ্নের উদয় হয় মনে।

তবু মায়ের চাপে, পিতার তাড়নায় বালককে পড়তে হলো। একদিন ইস্কুলের পাঠ শেষ করে ভর্তি হতে হলো চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নের জন্য। কিন্তু প্রাকৃতিক রূপরাশি যার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, পশুপাখী ও গাছপালার সংগে যার সখ্যতা গড়ে উঠেছে, ঘর অপেক্ষা বাহিরটা যার কাছে প্রিয়, তার কী চুপ করে বসে থেকে ওষুধের ফরমুলা মুখস্থ করতে ভাল লাগে ? তাই পাঠ্যপুস্তকের প্রতি আদৌ উৎসাহ ছিল না তার। গাছগাছড়া সম্বন্ধে লেখা বই-ই খুঁজতো এবং এই ধরণের একখানা বই হাতে পেলেই বারবার পড়তো।

এই সময় বালকটির হাতে আসে হামবোল্ডের লেখা পারসোন্যাল ন্যারেটিভ নামে একখানা বই। বইটি পাঠ করার পর বালকটি বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে আরও কৌতূহলী হয়ে উঠে। সেই প্রথম যেন জানতে পারে, দেশ বিদেশের বিভিন্ন পরিবেশে গড়ে উঠেছে কত বিচিত্র ধরণের জীব ও উদ্ভিদ জগৎ। এক পরিবেশের জীব ও উদ্ভিদের মিলও তেমন নেই।

অবাক হলো বালক। ভাবলে মনে, বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে হলে দেশভ্রমণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। কিন্তু কেমন করে লাভ করা যাবে সে সুযোগ ?

এই সময় বালকের এমন উদ্‌ভ্রান্ত মন দেখে বাবা বুঝলেন, ওর দ্বারা আর যাই হোক রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নয়। তাই তিনি

অপর এক সম্মানজনক পদ তথা ধর্মযাজকের পদ ভবিষ্যতে যাতে অলংকৃত করতে পারে তারজন্য চিকিৎসাবিদ্যার পরিবর্তে ধর্মশাস্ত্র পাঠে বাধ্য করালেন এবং ভর্তি করে দিলেন কেম্‌ব্রিজের ক্লাইস্ট কলেজে। এইখানেই বালকটি উদ্ভিদবিদ্যা পাঠের সুযোগ পেয়ে গেল, গুরু হিসেবে লাভ করলো হেনস্‌লো নামে তৎকালীন এক নামকরা উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপককে। বয়স তখন তার আঠার বছর। আর এতদিনেই আশা পূর্ণ হলো বালকের। পাঠের মধ্যে লাভ করলো পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি। নদীর উন্নত জলস্রোত যেন খুঁজে গেল সাগরকে।

অধ্যাপক হেনস্‌লোও বালকের মনের খবর টের পেয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলন, প্রকৃতি প্রেমিক বালকটির উদাস চোখ দুটিতে বিশ্বের ক্ষুধা। খাঁচার পাখীর মত, জেলের কয়েদীর মত, পাঠশালায় আবদ্ধ শিশুর মত কেবল মাত্র দেহটাকেই বন্দী করে রাখা হয়েছে। আর মনটা পড়ে আছে দেশ বিদেশের বন্দরে বন্দরে, সমুদ্র নদীর কূলে কূলে, গিরি কন্দরে ও অরণ্যের শ্যামলিমায়। বালকটির মধ্যে ছাই চাপা আগুনের মত একটা বিরাট প্রতিভা যে লুকিয়ে আছে তাও তিনি টের পেয়েছিলেন। তাই একটি প্রত্যাশারও উদয় হয়েছিল মনে। সুযোগ খুঁজতে লাগলেন, কেমন করে বালকটিকে প্রেরণ করবেন দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা সংগ্রহে।

কয়েক বছর পরেই এসে গেল এক সুযোগ। খবর পেলেন, ক্যাপ্‌টেন ফ্রিজরয় নামে জনৈক নাবিক জাহাজে করে দক্ষিণ আমেরিকায় অভিযান চালাবেন। তাঁর দরকার একজন প্রকৃতি-বিদের। অধ্যাপক মশাই খবর শুনেই ক্যাপ্‌টেনের সংগে যোগাযোগ করলেন এবং তাঁর প্রিয় ছাত্রটিকে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করলেন। ছাত্রটি তখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পন করেছেন এবং অধ্যাপকের উপদেশ শিরধার্য করে বিনা বেতনেই গ্রহণ করলেন জাহাজে প্রকৃতিবিদের কাজ।

পাঁচ বছর ধরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল যুবকটি তার সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে আরও যোলটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল। পরিশেষে বুঝতে পেরেছিল, জীবজন্তু ও মানুষ—কেউ ঈশ্বর সৃষ্ট নয়। একই উৎস থেকে আগমন হয়েছে সবার। ক্রমবিবর্তনের ধারাগুলো অতিক্রম করতে করতে কেউ হারিয়ে গেছে, কারও মধ্যে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে এবং ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে। আর মানুষ এসেছে বিবর্তনের একেবারে শেষ ধাপে।

সেদিনের সেই বালকটি আর কেউ নন, স্বয়ং চার্লস ডারউইন। যেদিন তিনি তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেছিলেন সেদিন মানুষের চিরাচরিত ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল বলে চারদিকে উঠেছিল বিতর্কের ঝড়। তাঁর অরিজিন অব্ স্পীসিস বইখানা অল্প কিছুদিনের ভেতরেই পৃথিবীর প্রায় সমূহ প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কথিত আছে, প্রথম প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই বিক্রি হয়েছিল বারশ' বই।

মাত্র কয়েকজন বিজ্ঞানী ছাড়া ডারউইনের মতবাদকে সেদিন কেউ মেনে নিতে পারেননি। বিশেষ করে প্রচলিত ঈশ্বরমুখী সৃষ্টিতত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেছিলেন ডারউইনের। এমনকি বহু শিক্ষিত এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও মেনে নিতে পারেননি তার মতবাদকে। অনেকেই প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করেছিলেন। ঈশ্বর বিশ্বাসের ভিত্তিকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেওয়ার জন্য ধর্মযাজকরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন পুস্তকটিকে বাজেয়াপ্ত করার জন্য। শেষপর্যন্ত জয় হয় ডারউইনের। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তথা বিবর্তনবাদকে মেনে নিতে বাধ্য হন বিজ্ঞানীরা। আর সেই সঙ্গে সবশ্রেষ্ঠ এক বৈজ্ঞানিক প্রতিভারূপে পরিচিত হন তিনি। এখন অবশ্য তাঁর মতবাদের বিরোধিতা করার কোন অবকাশ নেই। পৃথিবীর বুকে প্রাপ্ত জীবাশ্মগুলিই সমর্থন করেছে ডারউইনের মতকে।



আইনস্টাইনের ছেলেবেলা

জার্মানীর উলম শহর ছেড়ে ব্যবসার খাতিরে একটি পরিবার এসে বসবাস শুরু করলেন ইতালির মিলন শহরে। বাবা, মা, কাকা এবং তাঁদের একটি মাত্র এক বছরের শিশুপুত্র আলবার্ট।

বাবা ও কাকা শহরে ছোট্ট একটা কারখানা খুলে সবসময় ব্যস্ত থাকতেন কারখানার কাজে। আর মা ঘরে একা একা কাল কাটাতেন শিশুটিকে নিয়ে।

মা ছিলেন বেজায় ধর্মপ্রাণা। তার উপর চমৎকার তিনি বেহালা বাজাতে পারতেন। যখন হাতের কাছে কোন কাজ থাকতো না তখন বসে যেতেন বেহালা নিয়ে। আপন মনে গান গাইতেন, নতুন নতুন সুর তুলতেন বেহালায়, আর পড়াশোনাও করতেন।

শুক্লপক্ষের চাঁদের কলার মত, বর্ষার শস্যক্ষেত্রের মত, বসন্তের ফুলের কুঁড়ির মত দিনে দিনে বেড়ে উঠলো শিশুটি। একদিন তার মুখে বুলি এলো, পায়ে পায়ে হাঁটতে শিখলো আর মায়ের পাশে বসে গান শুনতে শুরু করলো। আর তখনই মা তার হাতে তুলে দিলেন বেহালার ছড়খানা।

মায়ের মধুকণ্ঠে সুরের যাদু এবং বেহালার সুরের মূর্ছনার সংগে আজন্ম পরিচিত শিশু খুশি হয়েই তুলে নিলে বেহালা এবং মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠে মিলিয়ে সেইদিনই শুরু করে দিলে গান। মাত্র ছ'বছর বয়স হতে না হতেই শিশু হয়ে উঠলো পাকা বেহালাবাদক। একদিকে প্রিয়দর্শন, হাসি হাসি মুখ এবং মিষ্টি স্বভাবের জন্য সবাই তাকে ভালবাসতো, অপরদিকে বেহালায় যখন একের পর এক সুরের ঝংকার তুলতো তখন অবাক হতেন বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী প্রত্যেকেই।

এই শিশু বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা আলবার্ট আইনস্টাইন। কথিত আছে, বিজ্ঞানের উচ্চ ডিগ্রী গ্রহণ না করে, পরীক্ষাগারের আশ্রয় না নিয়ে এবং হাতে নাতে কোন পরীক্ষানিরীক্ষা না করে একমাত্র প্রতিভার জোরেই বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছিলেন। এবং পরিচিত হয়েছিলেন পৃথিবীর সর্বদেশের ও সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরূপে।

আইনস্টাইনের এত বড় যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা তা বাল্যকালে আদৌ প্রকাশ পায়নি। অপরাপর দশটি ছেলের মত তিনিও ছিলেন অতি সাধারণ এক ছেলে। একমাত্র প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেছিলেন সংগীতে। হয়ত অনেকেই ভেবেছিলেন, এই ছেলে বড় হলে একজন বড় সংগীতজ্ঞই হবে। কিন্তু বড় বিজ্ঞানী যে হতে পারবে—এমন কথা স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি।

যথা সময়ে আলবার্টকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ে পাঠকালে বিজ্ঞানের পরিবর্তে দর্শনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। কাণ্টের দর্শন ছিল তাঁর কাছে অতি প্রিয় গ্রন্থ। প্রায় পনের বছর যখন বয়স তখনই তাঁর হাতে এসেছিল ইউক্লিডের জ্যামিতি খানা। বইটি পড়েই জ্যামিতির প্রতি উৎসাহ বোধ করলেন—বুঝিবা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলো এইখানে। সুপ্ত

প্রতিভা হলো জাগরিত এবং এতদিনে তা প্রকাশিত হওয়ার যেন মাধ্যম খুঁজে পেলো।

আলাবার্টকে মুগ্ধ করেছিল জ্যামিতিক চিত্রগুলি। আর ঐ চিত্রগুলি থেকে বিভিন্ন ধরণের উপপাদ্যকে প্রমাণ করার প্রবণতা আসে। কথিত আছে, এই সময় রাত জেগে দিনের পর দিন জ্যামিতিক চিত্রের পর চিত্র এঁকে যেতেন এবং নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে যত্নবান হতেন।

সে সময় আলবার্ট পড়াশোনা করতেন মিউনিখের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। এটি অবশ্য তাঁর মায়েরই ইচ্ছায় হয়েছিল। কিন্তু পিতার ইচ্ছা ছিল, আলবার্ট পড়াশোনা করে একজন প্রযুক্তিবিদ হোক এবং তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করুক! তথাপি আলবার্টের মায়ের বিরোধিতা করেন নি তিনি। সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষে কোন একটি টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবেন—এমন আশাও পোষণ করেছিলেন।

ঐ বয়সেই আলবার্টের জীবনে ঘটে গেল এক বিশেষ ঘটনা। পিতা হেরম্যানের ব্যবসার হঠাৎ ভরাডুবি ঘটে গেল। বাধ্য হয়ে অর্থাভাবে আলবার্টকে স্কুল ছেড়ে ঘরে বসতে হলো। যেহেতু অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ছিলেন আলবার্ট এবং খেলাধুলা, গল্প-গুজব, হৈ-হল্লা বড় একটা ভালবাসতেন না—তাই স্কুলের বাহিরে নিঃসঙ্গ দিনগুলোর সঙ্গী হয়ে উঠলো ইউক্লিডের জ্যামিতি এবং নিউটনের প্রিন্সিপিয়া। জ্যামিতি, অঙ্ক ,ও পদার্থবিজ্ঞানকে নিয়ে মেতে উঠলেন। আর এতদিনে বিজ্ঞানের প্রতি এলো প্রবল অনুরাগ। কলেজ ছেড়ে নিঃস্ব খামার বাড়ীতে নিউটন যেমন সাধনায় মেতে উঠেছিলেন—এও তেমনই। তবে খামার বাড়ীতে নিউটন নিউটনত্ব লাভ করলেও আলবার্ট পারেননি "আইনস্টাইন" হতে। তথাপি স্কুল ছাড়াটা আলবার্টের জীবনে শাপে বর হয়েছিল।

প্রায় দু বছরকাল ঘরে বসে কাটাতে হয়েছিল আলবার্টকে।

ঐ সময়ের পরে পিতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলেন ব্যবসায়। অর্থকষ্ট লাঘব হলো এবং বালক আলবার্টকে আবার প্রেরণ করা হলো বিদ্যালয়ে। এবার কিন্তু পিতার ইচ্ছানুসারেই একটি টেকনিক্যাল স্কুলে ভর্তি করা হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য আলবার্টের। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্যই হলেন। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সফল হলেন পরীক্ষায়।

পিতা এবার বালককে নিয়ে গেলেন জুরিখ শহরে। সেখানকার একটি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ভর্তিও করিয়ে দিলেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গণিত ও পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধেও শুরু করলেন পড়াশোনা করতে। পরিশেষে ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিবর্তে বিশ্ব প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে হলেন প্রবৃত্ত। ব্যবসার মাধ্যমে ধনবান হওয়ার সরল পথকে বর্জন করে শুদ্ধ বিজ্ঞানকে নিয়েই মেতে উঠলেন। অল্প বেতনে একটি স্কুল মাষ্টারের পদ জোগাড় করে নিজের খরচ নিজেই চালাতে লাগলেন।

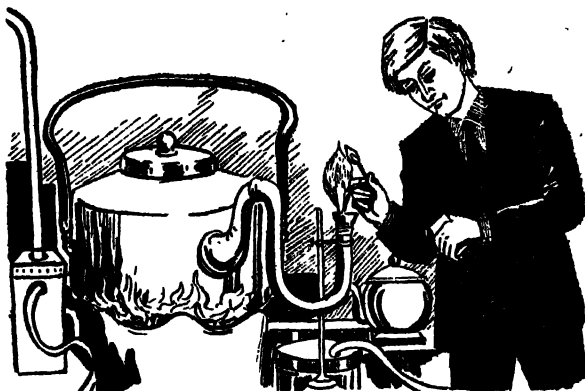
১৯০১ সালে স্নাতক হওয়ার পর তাঁর ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটে। বার্ণ শহরে একটি পেটেণ্ট অফিসে চাকরি নিলেন এবং অবসর সময়ে অঙ্ক নিয়ে মেতে উঠলেন। ছোট্ট একটা গবেষণাগারও ছিল না, কোন সহযোগীও ছিল না তাঁর। থাকার মধ্যে ছিল একখানা সাদা খাতা এবং একটি পেন্সিল। আর ঐ দুটিকে অবলম্বন করে ১৯০৫ সালে লিখলেন “অন দি ইলেকট্রো ডায়নামিক্স অব মুভিং বডিজ” নামে ত্রিশ পৃষ্ঠার এক প্রবন্ধ এবং সেটিকে প্রকাশ করলেন একটি বিজ্ঞান পত্রিকা।

প্রবন্ধটি প্রকাশের সংগে সংগেই একটা বড় রকমের সাড়া পড়ে যায় এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি স্বীকৃতি লাভ করেন একজন বিজ্ঞানী হিসেবে।

উক্ত ঘটনার প্রায় পনের বছর পরেই প্রকাশিত হয়েছিল "রিলেটিভিটি—দি স্পেশ্যাল অ্যান্ড জেনারেল থিওরি"। এটিও ছিল একটি প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পরেই বিজ্ঞানীমহলে তুমুলভাবে তর্কবিতর্কের ঝড় বয়ে যায়। তার কারণ, এতকাল বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, জড় পদার্থকে সৃষ্টি করা যায় না এবং ধ্বংসও করা যায় না। কিন্তু আইনস্টাইন অংক কষে দেখিয়ে দিলেন, জড়পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং শক্তিও রূপান্তরিত হয় জড় পদার্থে।

এবার আর বিতর্ক ও বাদানুবাদ নয়, বিজ্ঞানীরা বাস্তব পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। অনেকে অনেক যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসে গেলেন পরীক্ষা করতে। শেষে আইনস্টাইনের তত্ত্বই সত্য প্রমাণিত হলো এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববন্দিত হলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। স্বীকার করলেন সবাই, নিউটনের পর এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার বিজ্ঞানে আর হয়নি।

বিজ্ঞানে কোন উচ্চ ডিগ্রী ছিল না আইনস্টাইনের, বাল্যকালেও তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেনি আদৌ। তথাপি তিনিই শতব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক। প্রতিভার স্ফুরণ মানুষের মধ্যে কখন্-কোন্ সূত্রকে অবলম্বন করে যে ঘটে থাকে—তা বলা বড় শক্ত!



মার্ডকের ছেলেবেলা

এক ছিল সুবোধ বালক। রোজ রোজ পাহাড়তলিতে পশু চরাতে যেতো। আর সংগে করতো ছুতোর মিস্ত্রীর সাজ-সরঞ্জাম। পশুরা যখন আপন মনে চরে বেড়াতো, অন্যান্য রাখাল বালকেরা যখন খেলাধুলায় মেতে উঠতো, তখনই বালকটি বসে যেতো করাত বাটালি চালাতে।

বালকটির হাতটাও ছিল ভারি পাকা। এমন সব খেলনা, এমন সব ঘর-সংসারের জিনিসপত্তর বানাতো—যা দেখে বড়রাও গালে হাত দিতেন। উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল তেমনই। সে অপরের অনুকরণ কেবল করতো না, নতুন নতুন খেলনা এবং আসবাব বানাতেও ওস্তাদ ছিল। তার উপর কাঠের উপর লতাপাতা ও ফুল পাখীর এমন সব নকসা তুলতো যে, বড় বড় কারীগররাও হার মানতো।

বালকটির বয়স একটু বাড়তেই প্রতিবেশীরা এবং আত্মীয়-স্বজনেরা উপদেশ দিলেন শহরে গিয়ে কাজ শিখতে। তাঁদের কেমন যেন ধারণা হলো, এ ছেলে বড় হলে এক মস্ত কারিগর হবে।

বাবাকেও বোঝালেন তাঁরা। বাবা বললেন—আমরা যে বড় গরীব। পয়সা খরচ করে ছেলেকে কাজ শেখাব কেমন করে?

অভিজ্ঞ একজন প্রতিবেশী বললেন—তার জন্য ভাবনা কী? শহরে বহু কারখানা আছে—যারা ভাল হাতের কাজ দেখলে

শিক্ষানবীশ হিসেবে গ্রহণ করে। কাজ শেখায় এবং কিছু পয়সা-কড়িও দেয়। একবার চেষ্টা করতে আপত্তি কোথায় ?

কথাটা বালকের বেশ মনে ধরলো। একদিন সামান্য কিছু পয়সা-কড়ি ট্যাঁকে গুঁজে যাত্রা করলো শহরে এবং অল্পায়াসে জুটিয়েও নিলে একটা কারখানায় শিক্ষানবীশের কাজ।

দিন যায়। বালকটি দিনের বেলায় কারখানায় কাজ করে আর রাতে মনের খেয়ালে কাঠের উপর নক্‌সা তোলে। সে সময় বিদ্যুতের আলো কিংবা অপর কোন জোরালো ধরণের আলো না থাকায় মোমবাতি অথবা প্রদীপের টিম টিমে আলোতে কাজ করতে হতো বালককে। এত কম আলোতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নক্‌সা করতে বেজায় অসুবিধা অনুভব করলে সে। ভাবলে একদিন, এমন কোন আলো কী পাওয়া যাবে না—যা মোমবাতি থেকে অনেক অনেক গুণে আলো দিতে পারবে ?

শুরু হলো খোঁজাখুঁজির পালা। কী জানি কেন, বালকের প্রথমেই দৃষ্টি পড়লো খনি থেকে তোলা কয়লার উপরে। কয়লাকে পুড়িয়ে এত তাপ পাওয়া যাচ্ছে, আলো কী পাওয়া যাবে না ? কয়লাকে পোড়ালে তো প্রচুর গ্যাস বেরোয়! সে গ্যাসকে জ্বালালে কী আলো হবে না ? একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয় ?

বালক বুদ্ধি খাটিয়ে একদিন খুব বড় করে একটা লোহার কেটলি বানিয়ে আনলো এবং বাজার থেকে কিনে আনলে একটা লম্বা রবারের নল। মালিকের কাছ থেকে কিছু কয়লা চেয়ে এনে সন্ধ্যা বেলায় জুড়ে দিলে পরীক্ষা।

প্রথমে করলে কী ? বেশ বড় একটা কয়লার উনান খাড়া করলে। তারপর কেটলির ভেতরে কয়লা পুরে এবং মুখটাকে তার ভালভাবে বন্ধ করে বসিয়ে দিলে জ্বলন্ত উনানে। কেটলির পাশের নলটির সঙ্গে জুড়ে দিলে রবারের নল। নলের ছিদ্র দিয়ে যাতে

একই সময়ে বেশী গ্যাস বেরুতে না পারে তার জন্য সরু ছিদ্রওয়ালা ছিপিরও ব্যবস্থা করলে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল। কেটলীর ভেতরের কয়লাটা ভালভাবে উত্তপ্ত হতেই নলের মুখে দেখা গেল ধোঁয়ার রেখা। গ্যাস যখন তীব্রভাবে বেরুতে শুরু করলে তখনই একটা জ্বলন্ত দেয়াশলাইয়ের কাঠি ধরলে গ্যাসের ভেতরে আর যায় কোথায়? আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো ঘরখানা। আর সে কী চোখ ঝলসানো আলো! বালকের মনের আশা পূর্ণ হলো এতদিনে।

ঘটনাটা অতি সামান্য সন্দেহ নেই। তবে কয়লা থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হতে পারে এবং সেই গ্যাস যে জ্বলতে পারে—এ ধারণা সেদিন কারও ছিল না। এমনকি বড় বড় বিজ্ঞানীদেরও না। তাছাড়া এমন জোরালো আলো যে পাওয়া যেতে পারে—এও ছিল সবার ধারণার বাহিরে। অতএব খবরটা ছড়িয়ে পড়তে দেরি হলো না।

কয়েকদিনের ভেতরেই শহরে রটে গেল, এক কিশোর এমন এক আলোর ব্যবস্থা করেছে—যা দিনের আলোকেও হার মানায়। যাঁরাই শুনলেন, তাঁরাই অবাক হলেন। কয়লা থেকে গ্যাস বেরোয় কেমন করে আর কেমন করেই বা জ্বলে? মোমবাতি অপেক্ষা কতখানি জোরালো সেই আলো?

দেখতে দেখতে শহর ভেংগে পড়লে বালকটির বাসায়। আলো দেখতে সন্ধ্যা হলেই দলে দলে মানুষ ছুটে আসতো আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে আলোর সেই চোখ ঝলসানো রূপ দেখতো। সাধারণ লোক থেকে বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত কেউ বাদ পড়লেন না।

কথাটা কানে যেতে সে সময়ের নাম করা এক বিজ্ঞানী হামফ্রে ডেভিও ছুটে এলেন। বালকের কারিগরি দক্ষতা দেখে দারুণ খুশি হলেন তিনি। এবং বালককে উৎসাহিতও করলেন আর তখনই বালক বলে ফেললে—এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এক একটা শহরকেও রাতে আলোকিত করা যেতে পারে।

ডেভি কিন্তু ভরসা পেলেন না। ভাবপ্রবণ কিশোরটির ভাবালুতা ভেবে মনে মনে বুঝি হেসেও ছিলেন।

কিছুকাল পরের ঘটনা। রাতে বার্মিংহাম শহরটায় আলোর বন্যা বহিয়ে দিয়ে সবাইকে তাক লাগাতে চাইলো ?, কিন্তু টাকা-কড়ি তো তার নেই! কোথায় পাওয়া যাবে বড় বড় কেটলি, এত কয়লা এবং রবারের নল ?

অনেক ভেবে চিন্তে শেষে কারখানার সেই মালিককেই ধরে বসলে। অনুনয় বিনয়ও করলে ঢের।

মালিক কিন্তু লোক ছিলেন বেশ ভাল। কাজ পাগল এই শান্ত ও নম্র ছেলেটিকে বেজায় ভালবাসতেন তিনি। তাই বালকের মনের ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখলেন না। নিজেই আনিয়ে দিলেন কয়লা, কেটলি এবং বেশ কিছু রবারের নল।

কিশোরটি এবার কাজে লেগে গেল। একদিন রাতের আঁধার ঘনীভূত হওয়ার সংগে সংগে একের পর এক রবারের নলকে টেনে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বেঁধে দিলে। তারপর নলগুলোর অপর প্রান্ত যোগ করলো পূর্বের মত কেটলির সংগে। কেটলি থেকে গ্যাস উৎপন্ন হতেই একজন নলের প্রান্তগুলোতে অগ্নিসংযোগ করলে।

রাতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে শিউরে উঠলো শহর। সবাই ভেবে নিলে রাস্তার উপর কোথাও আগুন ধরে গেছে। হুড় হুড় করে বেরিয়ে এলো সবাই। কিন্তু যা দেখলে তাতে তারা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলে না।

এই ছেলেটিই গ্যাসের আলোর আবিষ্কর্তা উইলিয়ম মার্ডক। বিদ্যুৎকে কাজে লাগানোর পূর্ব-পর্যন্ত তাঁরই পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর সমস্ত শহরকে আলোকিত করা হলো। অপর-দিকে রেল ইঞ্জিনেরও প্রথম রূপকার তিনিই। যদিও সেদিন তাঁর তৈরি ইঞ্জিনকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।



লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ছেলেবেলা

এক ছিল বালক। যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই সুরেলা গলা। শুধু তাই নয়, বিদ্যেবুদ্ধিও অসাধারণ। যা একবার দেখতো বা শুনতো—তা চিরকালের জন্য তার মানসপটে মুদ্রিত হয়ে যেতো।

গান ছাড়া বালকটির আরও দুটি জিনিস ভাল লাগতো। ছবি আঁকা এবং অংক কষা। কোন কিছুর মডেল তৈরি করতেও তার জুড়ি ছিল না। ছবি আঁকতে বা অংক কষতে বা মডেল তৈরি করতে বসলে সে সেই বয়সেই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতো, নাওয়া খাওয়া ভুলে যেতো এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বসে থাকতো—জগতের কোন কোলাহল তার কানে প্রবেশ করতো না।

মা ছিলেন শিক্ষিতা এবং সংগীতজ্ঞা। কোথায় খেলাধুলা করবে, দৌড় ঝাঁপ করবে, দুষ্টুমিতে দুষ্টুমিতে সবাইকে অস্থির করে ছাড়বে—তার জায়গায় শুধু বসে বসে অংক কষা নয়তো ছবি আঁকা। ছেলের ভাবগতিক দেখে মা মাঝে মাঝে শংকিতাও হতেন। বুঝিবা ছেলেটা পাগল হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বোঝাতে চেষ্টা করতেন, খেলাধুলার জন্য উৎসাহিত করতেন, কখনও ছেলের সংগে গল্প জুড়ে দিতেন, তবু কিছুতেই কিছু হতো না।

বাবার কিন্তু উল্টো ধারণাটাই ছিল। তিনি মনে করতেন, এ ছেলে বড় হলে মানুষের মত মানুষ হবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, হয়ত প্রচুর অর্থও উপার্জন করবে। তাই ছবি আঁকতে এবং মডেল তৈরি করতে উৎসাহিত করতেন ছেলেকে।

বালকটির বাবা ফ্লোরেন্সের একটি দোকানে মুহুরীর কাজ করতেন। একবার এক কৃষক এসে তাঁকে একটা কাঠের ঢাল দিয়ে গেলেন ফ্লোরেন্স থেকে সুন্দর করে নক্সা করিয়ে আনার জন্য। বাবা ভাবলেন, কাজটা ছেলেকে দিয়েই করিয়ে নেওয়া যেতে পারে। তখন তিনি ডাকলেন বালককে। বললেন—এই ঢালটার উপরে নক্সা তুলতে পারবে? বালকটি জিজ্ঞাসা করলে—কী ধরণের নক্সা তুলবো বাবা?

বাবা একটু চিন্তা করলেন। বললেন—তুমি তোমার ইচ্ছা মতই নক্সা করবে। যেন খুব সুন্দর হয় এবং পাকা কারিগরের মত হাতের কাজ হয়।

বালক ঢালটি নিয়ে চলে গেল। ভাবতে শুরু করলে, কী ধরণের নক্সা হলে মানাবে ঢালখানাকে! কিছুটা নতুনত্বও আনাতে হবে।

বালক অনেক ভেবে শেষে স্থির করলে, দুটো ড্রাগনেরই ছবি খোদাই করবে ঢালটার উপরে। কিন্তু একটা মডেল তো দরকার! কাকে মডেল করবে?

কয়েকদিন পরে বালকের কাজটা দেখার জন্য ঘরে ঢুকলেন বাবা। কিন্তু এ কী? ঘরে ঢোকার মুখে এত দুর্গন্ধ কেন? নাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ঘরে ঢুকতে রীতিমত অবাক হলেন বাবা। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে কতকগুলো মরা সাপ। সেগুলো পচে উঠেছে, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে আর বালকটি নির্বিকারভাবে বসে আছে আর ঢালের উপর নক্সা তুলছে। বাবার উপস্থিতিও টের পেলে না।

বাবা কিচ্ছুটি বললেন না। ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন ঘর ছেড়ে।

এই বালকটিই ইওরোপের রেনাসাঁস যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষা লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। ইনি একাধারে ছিলেন শিল্পী, বৈজ্ঞানী ও দার্শনিক। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লিওনার্দো সবকালের এক বিরাট বিস্ময়। কথিত আছে, বাল্যকালে তাঁর শিল্পী প্রতিভারই বিকাশ হয়েছিল। বাবা উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন বলে বালকের মাত্র বার কী তের বছর বয়সের সময় ফ্লোরেন্সে পাঠিয়ে দেন ছবি আঁকার নিয়মগুলো আয়ত্ত করার জন্য। সেখানে আন্দ্রে ভেরোশিও নামে ছিলেন এক নাম করা চিত্রকর। বাবার ইচ্ছায় ভেরোশিওই তালিম দিতে শুরু করেন নিওনার্দোকে।

কিছুকাল পরে ছবি আঁকার নিয়ম কানুনগুলো আরও করেছে কিনা পরীক্ষার জন্য গুরু নির্দেশ দিলেন একটা ছবি আঁকার জন্য। লিওনার্দো তখন মন থেকে আঁকলেন "ব্যাপটিজম অব ক্রায়েস্ট" ছবিটি। গুরু কিন্তু সামান্য এক বালকের মধ্যে এতখানি প্রতিভা আশা করেন নি। ভেবে ছিলেন কিছু ত্রুটি থাকবেই।

কিন্তু এ কী দেখলেন তিনি? এতটুকু খুঁত কোথাও নেই। ছবি একেবারে জীবন্ত যেন। গুরু বুঝতে পারলেন, তিনি নিজে আঁকলেও এত নিখুঁত ছবি কদাচ উপহার দিতে পারতেন না। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করলেন, জীবনে কোনদিন ছবি তিনি আর আঁকবেন না। ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বালকের শিল্প প্রতিভা জগতে শুধু বিরল নয়—একক।

হয়েছেও তাই। লিওনার্দোর আঁকা ছবিগুলির ধারে পাশে যাওয়ার মতও প্রতিভা পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পীর নেই। তাঁর আঁকা যীশুর "শেষ ভোজ" বা "লাস্ট সাপার" এর ছবি এবং "মোনালিসা" ছবি পৃথিবীতে একক।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি সত্যই এক আশ্চর্য প্রতিভা। জ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই—যাতে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি বা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাননি। সঙ্গীতে, চিত্রে, ভাস্কর্যে এবং কারিগরি বিদ্যায় ছিলেন অদ্বিতীয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়ও তিনি রেখেছেন সুচিরস্থায়ী অবদান। উদ্ভিদ বিদ্যা, শরীর বিদ্যা, শব্দবিজ্ঞান ও আলোক বিজ্ঞানকে তিনিই পুষ্ট করে গেছেন। যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাবারুদ নির্মান এবং নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সে যুগে তাঁর জুড়ি কেউ ছিল না।

প্রথমে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনাও লিওনার্দো দা ভিঞ্চির। তিনি মনে করতেন, পাখীর মত কৃত্রিম ডানা জুড়ে দিয়ে মানুষও আকাশে যথেচ্ছভাবে উড়তে পারবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটা পরিকল্পনাও খাড়া করেছিলেন। কলকব্জা দিয়ে কেমন করে ডানা যুক্ত করা যাবে তার একটা ছবিও তিনি এঁকেছিলেন।

নিওনার্দোর সেই ছবিটি প্রভাবিত করেছিল অনেককে। তাই কৃত্রিম ডানা জুড়ে দিয়ে অনেকেই সচেষ্ট হয়েছিলেন আকাশে উড়তে। যদিও এর বিষময় ফল ফলে ছিল, তবুও বলতে হবে আকাশে ওড়ার শুভ সূচনা করে গিয়েছিলেন তিনিই। পরবর্তী-কালে ডানা জুড়ে আকাশে উড়তে গিয়ে যখন পদে পদে সবাই হোঁচট খেলেন তখনই গ্লাইডার যুক্ত বায়ুযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং তখনই সার্থক হয়েছিল মানুষের আকাশে বিচরণ করার স্বপ্ন।

লিওনার্দোর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী ছিল না। অসাধারণ প্রতিভা, পড়ার প্রতি গভীর আগ্রহ এবং সব কিছুকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার কৌতূহলই তাঁকে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় করে রেখেছে।



গ্যালিলিওর ছেলেবেলা

এক ছিল তরুণ। সৌম্য, শান্ত ও ধর্মভীরু। তাই বলে ধর্মের গোঁড়ামিকে সে পছন্দ করতো না, প্রতিটি ঘটনার পেছনে কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজতো এবং যাচাই না করে কোন কিছুকে মেনে নেওয়া স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

বুদ্ধিও ছিল ঝকঝকে তরোয়ালের মত। কী পড়াশোনায়, কী যন্ত্র তৈরিতে! কোন কিছুকে হাতে নাতে যাচাই করতে এমন সব নতুন নতুন যন্ত্র বানাতো এবং এমন সব মডেল তৈরি করতে পারতো যা দেখে তাক লেগে যেতো সবার চোখে।

ধর্মীয় পরিবেশে মানুষ হওয়ার জন্য তরুণটিকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় গির্জায় যেতে হতো প্রার্থনা করার জন্য। কখনও একা একা, কখনও বন্ধু বান্ধবের সংগে।

সন্ধ্যায় গীর্জায় ভিড় হতো প্রচুর। সেকালে আবার বিদ্যুতের আলো ছিল না, গ্যাসের আলো ছিল না, ছিল না কোন জোরালো ধরণের আলোর ব্যবস্থা। তাই সন্ধ্যা হলে গীর্জার ছাদ থেকে মোটা দড়িতে বেঁধে একটা ঝাড় লন্ঠনকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ঝাড়ের চারপাশে কাচের গেলাসগুলোতে জ্বলতো মোটা মোটা

মোমবাতি। যেটুকু আলো পাওয়া যেতো তাতেই চলতো প্রার্থনার কাজ।

তরুণটি রোজ রোজ দেখতো, আলো জ্বালিয়ে তুলে দেওয়ার পর দোল খেতো ঝাড়টা। প্রথম প্রথম দোল খেয়ে বেশী পথ অতিক্রম করতো তারপর মন্দীভূত হতো তার গতি। একদিন তরুণটির যেন মনে হলো, পথের দূরত্ব বেশী-কম যাই হোক না কেন প্রতিবার দোল খেতে একই সময় লাগছে। কিন্তু পরীক্ষা করা যাবে কেমন করে।

হার মানবার পাত্র তরুণটি ছিল না। বুদ্ধি করে চেপে ধরলো কব্জির নাড়িটা। ধুক-ধুক-ধুক—এক-দুই-তিন করে মনে মনে নাড়ির সেই ধুকধুকানির সংখ্যাই গণনা করতে শুরু করে দিলো। হাঁ, যা ভেবেছে—ঠিক তাই! ঝাড়টা এক জায়গা থেকে দোল খেয়ে পুনরায় সেই জায়গাটিতে ফিরে আসতে একই সংখ্যক ধুকধুকানি হচ্ছে। ব্যস্! গীর্জায় প্রার্থনা করা মাথায় উঠলো এবার।

পরদিনই তৈরি করিয়ে আনলো ছোট বড় কয়েকটা সীসার বল। শুরু করলে ওদের একে একে সুতোয় বেঁধে দোলাতে। মজে রইলো ছেলেমানুষী খেলায়।

কিন্তু কী আশ্চর্য! ঐ ছেলেখেলা থেকেই তরুণটি সেদিন আবিষ্কার করে ফেললে দোলকের দোলন সংক্রান্ত নিয়মগুলো—যা নিঃসন্দেহে পদার্থ বিজ্ঞানের একটি মহত্তম আবিষ্কার। আর আবিষ্কারকের বয়স তখন মাত্র সতের বছর।

আর একদিনের ঘটনা। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্তোতলের অনুগামীর সংখ্যা তখন ইতালিতে প্রচুর। তাঁদের কাজ ছিল, জনসাধারণকে উপদেশ প্রদান, নতুন নতুন শিষ্য সংগ্রহ করা এবং উপদেশের মাধ্যমে জনচিত্ত জয় করে অর্থ উপার্জন। সেদিন কারও এক প্রশ্নের উত্তরে অ্যারিস্তোতলের জনৈক শিষ্য বললেন, উপর

থেকে নিচের দিকে বেশী ওজনওয়ালা বস্তু আগে নামবে এবং অপেক্ষাকৃত কম ওজনের বস্তুর নামতে দেরি হবে।

তরুণটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল কথাগুলো। শিষ্যের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই শুরু করে দিলে প্রতিবাদ। বললে—না, কক্ষণো হতে পারে না।

রেগে উঠলেন শিষ্যটি। বললেন—গুরুদেব অ্যারিস্তোতলের কথা কী মিথ্যে হতে পারে? নাকি তাঁর চেয়ে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে পারে?

তরুণটি পরিহাস করে বললো—রাখ তোমার অ্যারিস্তোতল! তাঁর বিদ্যেবুদ্ধি ঐ তর্কের উপরেই সীমাবদ্ধ। কোনদিন কী পরীক্ষা করেছিলেন, না পরীক্ষার কথা বলে গেছেন?

কী অ্যারিস্তোতলের নামে এত দুর্নাম! যিনি সত্যদ্রষ্টা, যিনি বিজ্ঞানের জন্মদাতা, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ যাঁকে দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করে আসছে—তাঁর বিদ্যে-বুদ্ধি ছিল না! যত বিদ্যেবুদ্ধি আজকের দিনের একটা সামান্য ছেলে ছোকরার!

মার মার হয়ে এগিয়ে এলেন শিষ্যরা। তরুণটি মৃদু হেসে বললে—এত রাগ করছো কেন? তোমাদের গুরুর কথা সত্য না মিথ্যে একবার হাতে নাতে পরীক্ষা করে দেখই না! তারপর না হয় যা খুশি বলো আমাকে।

পুনরায় বিদ্রুপের সুরে তরুণটি বললো—পরীক্ষা করার সৎসাহস আছে তো তোমাদের!

শিষ্যরা একবাক্যে চিৎকার করে উঠলেন—আলবৎ আছে। আমাদের গুরুর কথা কখনও মিথ্যে হতে পারে না। কিন্তু পরীক্ষাটা কী ভাবে করবে শুনি?

তরুণটি দৃঢ় কণ্ঠে বললে—ঐ যে দূরে দেখা যাচ্ছে হেলান দেওয়া অথচ আকাশ ছোঁয়া পিসার টাওয়ার—যা পৃথিবীর

আশ্চর্যগুলির মধ্যে অন্যতম, তারই উপর থেকে বেশী ও কম ওজনের দুটি বস্তুখণ্ডকে একই সংগে গড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অ্যারিস্তোতলের শিষ্যরা সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। আর সেই তরুণটি নিজেই আরোহণ করলে টাওয়ারের উপর দুটি ছোট ও বড় লোহার বলকে নিয়ে। অবশেষে একই সঙ্গে দুটিকে গড়িয়ে ঠেলে দিলে নিচের দিকে।

তরুণের কথাই সত্য প্রমাণিত হলো এবং ভুল বলে প্রমাণিত হলো অ্যারিস্তোতলের মতবাদ। কিন্তু এত সহজে শিষ্যরা ভুল স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। তাঁরা সবাই প্রতিবাদ জানালেন। বললেন—তরুণটি এই পরীক্ষা প্রদর্শনের বেলায় অবশ্যই কারচুপি করেছে। তা না হলে আকাশের চন্দ্র-সূর্যের মত সত্য মহামনীষী অ্যারিস্তোতলের কথার কী ভুল হতে পারে।

প্রবল জনমতের চাপে পিছু হটতে বাধ্য হলো তরুণ। শুধু ভাবলে মনে মনে, এঁরা কী? নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে চায় না, গুরুর মিথ্যে কথাকেও সত্য বলে জাহির করতে চায়, গুরুর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই গুরু অপমান বলে মনে করে? আশ্চর্য ওদের অন্ধ বিশ্বাস আর আশ্চর্য ওদের সংস্কার!

সেদিন তরুণটি মুখ ব্যাজার করে চলে গেল বটে, তবে তৈরি করে গেল একটি বিরোধী গোষ্ঠী যারা তার জীবনের শেষদিন পর্যন্তও বিরোধিতা করেছিল এবং তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল।

এই তরুণটিই সপ্তদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মহাত্মা গ্যালিলিও। শুধু সপ্তদশ শতাব্দীর কেন, সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীও। আর্কিমিদিসের পর দেড় হাজার বছরেও এত অবদান বিজ্ঞানে কেউ রাখতে পারেননি। অপর দিকে নিউটনের আগমনের পথকে ইনিই পরিষ্কার করে রেখেছিলেন। তাই বিজ্ঞানের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আশ্চর্য মহামতি গ্যালিলিও।

গ্যালিলিওর অসাধারণ প্রতিভার বিকাশ বাল্যেই ঘটেছিল। সম্ভ্রান্ত ও ধনীপরিবারে জন্ম হয়েছিল তাঁর। পিতা ছিলেন এক দার্শনিক। বাল্যকালে বালকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে বিস্মিত হতেন পিতা। হাতে নাতে করে দেখার প্রবণতাও পিতাকে মুগ্ধ করেছিল। তাই একদিকে বালকের প্রতিভাবিকাশের পথকে প্রশস্ত করতে যেমন সচেষ্ট হয়েছিলেন অপরদিকে তেমনই বালকের কোন ইচ্ছাকেই অপূর্ণ রাখতেন না।

ছেলেবেলা থেকেই গ্যালিলিও যন্ত্রনির্মাণের প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিলেন। পিতা তৈরি করে দিয়েছিলেন ছোট্ট একটা গবেষণাগারের মত। বালক অধিকাংশ সময় সেখানে বসে থেকে খুটখাট করতো, বাহিরে যা দেখতো, তাকে রূপ দিতে চেষ্টা করতো, কখনও বা নিজের মন থেকে বার করতো নতুন নতুন যন্ত্র। সেই-সব যন্ত্র দেখে সহপাঠীরা কৌতূহলী হয়ে উঠতো, শিক্ষকেরা অবাক হতেন, আর বাবা ভাবতেন—এছেলে বড় হলে একজন নাম করা বিজ্ঞানীই হবে।

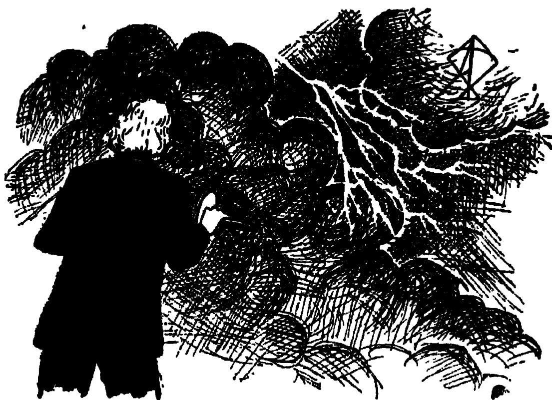
বালকের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে পিতা তাই বালকের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। স্কুলের পাঠ শেষ করার পর ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে। আপন মেধার গুণে দুদিনেই হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপকদের প্রিয়পাত্র। আর ঐখানে অধ্যয়ন কালেই তিনি গীর্জায় ঝাড়ের আলোর দোলার ছন্দ দেখে আবিষ্কার করেছিলেন দোলকের দোলনকালের নিয়মাবলী। পিসার টাওয়ার থেকে পরীক্ষাও চালিয়েছিলেন ঐ সময়।

গ্যালিলিওর আবিষ্কারের সংখ্যা অগণিত। পরিণত বয়সে তিনি এক শক্তিশালী দূরবীণ তৈরি করেছিলেন এবং সেই দূরবীণের সাহায্যে তাকিয়েছিলেন মহাকাশের পানে। চাঁদ, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি সম্বন্ধে তিনি প্রথম প্রদান করেছিলেন সঠিক তথ্য।

গ্যালিলিওই প্রথম জ্যোতির্বিদ—যিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন "Eppursi muove" অর্থাৎ সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘোরে। সেকালে সবার ধারণা ছিল, পৃথিবী স্থির হয়ে আছে এবং সূর্যকেই ঘুরতে হচ্ছে পৃথিবীর চারদিকে। গ্যালিলিওর কিছু আগে কোপারনিকাস অবশ্য সত্যটি তাঁর পুস্তকে লিপিবন্ধ করেছিলেন। তা হলেও তিনি কোন পরীক্ষার কথা উল্লেখ করেননি। প্রথম গ্যালিলিওই পৃথিবীর সূর্যপরিক্রমার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন।

ফল কিন্তু ভাল হয়নি। প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। এবং তাঁকে মৃত্যু ভয় দেখিয়ে প্রত্যাহার করানো হয়েছিল তাঁর আবিষ্কৃত সত্যের।

গ্যালিলিওর সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য ছিল—তার সংস্কারমুক্ত মন। সেই ধর্মের গোঁড়ামির দিনে, গোঁড়ামির গুটিকে কেটে কেমন করে যে এই প্রজাপতিটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল—তা ভাবতে অবাক লাগে। আর এই সংস্কারমুক্ত মনের পরিচয় প্রদান করেছিলেন বলেই তাঁকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। জন-প্রিয়তাও বিশেষ অর্জন করতে পারেননি। তবে সে আমলে যাঁরা প্রকৃত পণ্ডিত ছিলেন তাঁরা কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন গ্যালিলিও অদ্বিতীয়। আর ধর্মযাজকরা বিরোধিতা করলেও বুঝতে পেরে-ছিলেন গ্যালিলিওর কথা সত্য এবং তার তুল্য পণ্ডিত পৃথিবীর সর্বযুগেই বিরল। শুধু নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে গিয়েই বাধ্য হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল তাঁদের।



ফ্রাঙ্কলিনের ছেলেবেলা

বোষ্টন শহরে বাস করতেন একটি দরিদ্র পরিবার। পনেরটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে অতি কষ্টে সংসার চালিয়ে থাকেন পিতা। সর্ব-কনিষ্ঠ ছেলেটির নাম বেঞ্জামিন।

পিতার অবস্থা কিন্তু আগে এত খারাপ ছিল না। ধর্মীয় কারণে রাজরোষে পতিত হতে হয়েছিল তাঁকে। ফলে এক রকম কপর্দক শূন্য অবস্থায় ইংলণ্ড ত্যাগ করে বোষ্টনে এসে বসবাস করতে হয়েছিল। ঠিক ঐ সময় বেঞ্জামিনের বয়স ছিল মাত্র এক বছর।

বোষ্টনে এসে একটা সাবানের কারখানা স্থাপন করেছিলেন পিতা। বড় ছেলেদের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করেছিলেন, আর ছোট যারা তারাই থাকতো বাপমায়ের কাছে।

বেঞ্জামিন একটু বড় হতেই প্রাথমিক শিক্ষাদানের কাজ শুরু করলেন মা। পড়াতে গিয়ে মা অবাক হলেন। এ কী প্রতিভা! এত অল্প বয়স, তবু কোন কিছুকে একবার বৈ দু-বার বলতে হয় না! মাত্র কিছুকালের ভেতরে গড় গড় করে বই পড়তে শুরু করে

দিলে। আর পড়ার প্রতি সে কী আগ্রহ! হাতের কাছে যে কোন বই পেলেই শুরু করে দিত পড়তে।

মাত্র আট বছর বয়সেই বালক বেঞ্জামিনের জ্ঞানস্পৃহা এত প্রবল আকার ধারণ করলো যে, মা পারলেন না তার তৃষ্ণা মেটাতে। মাঝে মাঝে বালককে নানা ধরণের বই জোগাড় করে পড়তে দিতেন। আর নতুন কোন বই পেলেই দারুণ ভাবে উৎসাহিত হতো বালক এবং যত কঠিন বই হোক না কেন পড়া শেষ না করে কিছুতেই উঠতো না।

শুধু কী পড়া! বইর প্রতিটি ছত্রই যেন চিরকালের জন্য মুদ্রিত হয়ে যেতো বালকের মানসপটে। তার পড়া বই থেকে যে কোন দুরুহ প্রশ্ন করলে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিত।

বালকের মেধা দেখে পিতাও আশ্চর্য বোধ করতেন। ভাবলেন, এমন ছেলের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করা যায় না। ওকে উচ্চশিক্ষা দান করতে পারলে পৃথিবী লাভ করবে এক বিরল প্রতিভাকে এবং তাঁদেরও সমূহ দুঃখকষ্টের অবসান ঘটবে।

সংসারের খরচ কমিয়ে বাবা বেঞ্জামিনকে ভর্তি করিয়ে দিলেন তথাকার গ্রামের স্কুলে। উদ্দেশ্য, ছেলে এখান থেকে পাশ করে ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করবে। সেকালে ধর্মযাজকরাই ছিলেন যেহেতু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তাই এমন আশা জেগেছিল পিতার মনে।

মাত্র দুটি বছর গ্রামের স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল বেঞ্জামিন। সংসারের ব্যয়ের চাপে একেবারে হিমসিম খেতে লাগলেন পিতা। বেঞ্জামিনকে ডাকলেন একদিন। বললেন—তোমার পড়া শোনার জন্য অর্থ ব্যয় করা আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

মনে মনে খুবই ব্যথা পেল বালক। জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে

কী করতে হবে বাবা! বাবা বললেন—আজ থেকে তোমাকে তোমার নিজের পায়ে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

বালক জানে, এদেশের সব ছেলেকেই এই বয়স থেকে অর্থ উপার্জনের পথে নামতে হয়। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক বালককে একটা না একটা পেশায় অভ্যস্ত হতে হয়। তাই দ্বিরুক্তি করলে না সে। জিজ্ঞাসা করলে—আমাকে একটা কাজ জোগাড় করে দিন। আমি অবশ্যই করবো।

বাবা বললেন—আপাততঃ তুমি আমার সাবান তৈরীর কারখানায় কাজ শেখ। পরে দেখা যাবে—কী করতে পারি।

দশ বছরের বালক বেঞ্জামিনকে এবার নামতে হলো অর্থ-উপার্জনের প্রচেষ্টায়। কিন্তু একঘেয়ে সাবান তৈরির কাজ ভাল লাগলো না বেঞ্জামিনের। ততদিনে বই পড়ার নেশাটা আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বইকে নিয়ে মেতে উঠে আর এই বই পড়ার ভেতরেই বিশ্রামসুখ উপভোগ করে।

বাবা অচিরেই বুঝতে পারলেন, বেঞ্জামিন সাবান তৈরি করতে গিয়ে আদৌ আনন্দ লাভ করতে পারে না। কেমন যেন উদাসীন উদাসীন ভাব, আর যত আনন্দ সবই বই পড়ার মধ্যে। কিন্তু এত বই কোথায় পাওয়া যাবে!

বাবা একদিন বালককে ডেকে বললেন—আমি বুঝতে পেরেছি তোর সাবান তৈরীর কাজ ভাল লাগে না। ভাল লাগে শুধু বই পড়তে। ঠিক কিনা। বালক মৃদুস্বরে বললে—হ্যাঁ।

—প্রতিদিন নতুন নতুন বই কোথায় পাবি বল! তাছাড়া শুধু বই পড়লে তো হবে না, কিছু রোজগার তো করতেই হবে।

বালক বললে—আমিতো সব কাজই করতে পারি। সাবান তৈরি শিখে ফেলেছি সেই কবে!

মৃদু হাসলেন বাবা। বললেন—তা তো জানি। তবে হাতের কাছে বই না পেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়, তাই না?

বালক মাথা নোয়াল। বাবা পুনরায় বললেন—এক কাজ কর গে যা। তোর বড়দার কাছে থেকে ছাপাখানার কাজটা শিখে ফ্যাল। সেখানে নানা ধরণের বই ছাপার জন্য আসে আর বইও সহজে পাওয়া যায়। তোর সুবিধেই হবে।

বালক বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলে।

সেই বোস্টন শহরেই বড়দা জেমসের ছাপাখানা। যদিও ছাপাখানাটা ছোট, তবুও দাদার রোজগার মোটামুটি ভালই। বালক বেঞ্জামিন এবার শুরু করে দিলে দাদার কাছে কাজ শিখতে।

দিন যায়। বালক বেশ উৎসাহের সঙ্গেই কাজ করে এবং বই পড়ে। তাছাড়া প্রতিভাটা অসাধারণ হওয়ার জন্য অল্প কিছু কালের ভেতরেই সে একেবারে সুদক্ষ এক কারিগরে পরিণত হলো। খুব কম সময়েরই ভেতরে নিজের কাজটুকু সম্পন্ন করেই বসে যেতো বই পড়তে।

দাদা কিন্তু এই ধরতেন বই পড়াটাকে বিশেষ পছন্দ করতেন না। তিনি বুঝতেন কেবল কাজ এবং অর্থ উপার্জন। তাই কাজে ফাঁকি দিচ্ছে মনে করে বেঞ্জামিনের উপর বিরক্ত হতেন। বালকের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় দাদার বিরক্তির কারণ বুঝতে পারতো না। কিন্তু একটু বড় হতেই বুঝতে পেরে গেল। আর তখনই শুরু হয়ে গেল দাদার সঙ্গে খিটিমিটি।

বালক বেঞ্জামিন আবার খুবই স্বাধীনচেতা ছিল। মন দিয়ে কাজ করতো এবং মনের মত করে ভাল কাজ করতে চেষ্টা করতো। দাদার সঙ্গে এই নিয়ে যখন মতভেদ দেখা দিল তখন বালক ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিলে দাদার কাজ।

বালকের বয়স এখন ষোল কী সতের। ভাবলে সে এবার স্বাধীন ভাবেই শুরু করবে ব্যবসা। এবং নিজে নিজে বই লিখে ছাপবে। অবশ্য এর জন্য চাই আরও অভিজ্ঞতা এবং বেশ কিছু অর্থ।

হার মানলে না বালক। অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য একটা মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানে কাজ গ্রহণ করলে। কিছু টাকাকড়িও হলো। এবার এক অংশীদারকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই ফিলাডেলফিয়ার স্থাপন করলে একটি ছাপাখানা।

বেঞ্জামিন কাজ পাগলও ছিল আর ছিল অত্যন্ত সৎ। ঠকাবার চেষ্টা করতো না। কথা রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় সারারাত জেগেও কাজ করতো। ফলে অল্পদিনেই ছড়িয়ে পড়লো তার ছাপাখানার সুনাম।

এদিকে তার অংশীদারটির এ বিষয়ে খুব একটা আগ্রহ ছিল না, আর এত পরিশ্রমও করতে পারতো না। তা ছাড়া তার অন্য ব্যবসাও ছিল। তাই কিছুকাল পরেই সে তার নিজের অংশ বিক্রি করে দিলে বেঞ্জামিনকে। এবার পুরো মালিকানা লাভ করায় একরকম ঢেলে সাজিয়ে ফেললে ছাপাখানাকে।

কয়েক বছরের ভেতরেই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করলে বেঞ্জামিন। শীঘ্র তার প্রতিভা বিকাশেরও সুযোগ এলো। লাভ করলে পেনসিলভেনিয়া গেজেটের মালিকানা। আপন অধ্যবসায়, আন্তরিকতা এবং পাণ্ডিত্যের গুণে গেজেটটির সুনাম আরও ছড়িয়ে পড়লো। তারপর একদিন প্রকাশ করলে নিজেরই লেখা একখানা বই। নাম "পুওর রিচার্ডস আলমানাক"।

বইটি প্রকাশের সংগে সংগেই চারদিকে তুমুলভাবে সাড়া পড়ে গেল। বইটি বিক্রি হলো প্রচুর। ফলে একদিকে যেমন যথেষ্ট অর্থাগম হলো, অপরদিকে তেমনই নামও ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। দরিদ্রের সন্তান লাভ করলে বিশ্বখ্যাতি।

এই বেঞ্জামিন আর কেউ নন, প্রখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী এবং পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামনীষী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন। অধ্যবসায় মানুষকে যে কত বড় করতে পারে—তার জাজ্জ্বল্যমান

প্রমাণ তিনি একজন। অপরদিকে স্কুল-কলেজের ডিগ্রী ছাড়াও যে জ্ঞানের সাধনায় লিপ্ত হওয়া যায়—তাও তিনি প্রমাণ করে গেছেন।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। জ্ঞানের সবগুলি শাখায় বিচরণ করেছিলেন তিনি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে রেখে গেছেন সুচিরস্থায়ী অবদান। তাঁর মত জনদরদীও পৃথিবীতে বিরল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতাও ছিলেন তিনি। নিপীড়িত ও দরিদ্র মানুষের তিনি ছিলেন বন্ধু। আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন দুর্বলদের জন্য। মস্ত বড় দাতাও ছিলেন তিনি। কথিত আছে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে ইংলণ্ড ব্যতীত ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিতে আমেরিকার স্বপক্ষে জনমত গঠন করেছিলেন তিনিই।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন একাধারে ছিলেন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, সুবক্তা, সুলেখক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ধনাত্মক ও ঋণাত্মক—দু'ধরণের বিদ্যুতের প্রমাণ। আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মানুষের তৈরি বিদ্যুতের যে কোন প্রভেদ নেই—তাও তিনি প্রমাণ করেছেন। বজ্ররক্ষীরও আবিষ্কর্তা তিনি। আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামাতে গিয়ে একাধিকবার তিনি জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন।



মাদাম কুরীর ছেলেবেলা

পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ'। সেখানকার এক উচ্চ বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা ও গণিতের যেমন আদর্শবান শিক্ষক ছিলেন তেমনই স্বাধীনচেতা। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শিক্ষক, কোন অন্যায়কে বরদাস্ত করতে পারতেন না এবং অর্থ উপার্জনের দিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

সে সময় পোল্যাণ্ড ছিল রাশিয়ার জারশাসনের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু জাররা ছিলেন অত্যন্ত অত্যাচারী। তাঁদের অত্যাচার ও অপশাসনের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই শিক্ষকটিও ছিলেন অন্যতম। রাজার বিরুদ্ধাচরণের ফল হাতে নাতেই পেলেন। অর্থাৎ হারাতে হলো তাঁর শিক্ষকের পদটি। অন্য কোথাও চাকরিও হলো নিষিদ্ধ। একেবারে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় ভদ্রলোক ঘরে এসে বসলেন এবং মুষড়ে পড়লেন।

ভদ্রলোকের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। স্ত্রীও মারা গেছেন অনেক আগে। কাছে থাকে দুটি মেয়ে। বড়টির নাম ব্রনিয়া এবং ছোট মেয়েটির নাম মারী। দুটি মেয়েকেই আদর করেন। তবে জন্মের কিছুকালের মধ্যে মাতৃহারা হওয়ায় মারীকে যেন একটু বেশী ভালবাসেন।

দুটি মেয়েই পড়াশোনায় খুব ভাল। মারী আরও ভাল। একেবারে ফুলের মত মেয়ে যেন। দেখতে যেমন মিষ্টি, তেমনই মিষ্টি তার স্বভাবখানা। আর বাবার দিকে তার প্রখর দৃষ্টি। যেন একটা চোখ আর একটা কাণ সব সময় নিবন্ধ থাকে বাবার দিকে।

চাকরী যাওয়ার পর বাবাকে মুষড়ে পড়তে দেখে মারী ভারি বিব্রত বোধ করলে। বয়স তখন তার চৌদ্দ। একদিন বাবাকে বললে—তুমি অমন বসে বসে কী ভাবো বলতো বাবা? আমাদের আর আগের মত আদর করো না, চুপ-চাপ বসে থাকো, গপ্পো করো না, হাসো না! কেন কেন? চাকরি গেছে তো কী হয়েছে তাতে?

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন—চাকরীটা বজায় রাখা আমার উচিত ছিল মারী। পড়াশোনায় কত ভাল তোমরা, অথচ অর্থাভাবে পড়া বন্ধই করে দিতে হলো তোমাদের।

মারী দৃপ্তকণ্ঠে বললে—না, চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভালই করেছো। বিদেশীর চাকর হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল।

বাবা জানতেন, মারী বিদেশী শাসনকে আদৌ বরদাস্ত করে না। প্রকাশ্যে তাকে বিদ্রোহ ঘোষণাও করতে শুনেছেন তিনি। তাই এই চরম দুঃসময়ে মেয়ের কণ্ঠের দৃঢ়তা দেখে অনাবিল আনন্দ লাভ করলেন। তথাপি পাংশু মুখে যেন আপন মনেই উচ্চারণ করলেন—বড় সাধ ছিল মনে, তোদের দুটি বোনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করবো। ব্রনিয়া যাই হোক কিছু পড়াশোনা করেছে, কিন্তু তুই? লেখাপড়ায় এত ভালো, এমন প্রতিভা—একেবারে অঙ্কুরে বিনাশ হয়ে গেল রে!

মারী বললে—আমাদের জন্য তোমাকে আদৌ চিন্তা করতে হবে না। তোমারও তো বয়স হয়েছে। এখন আমাদেরই উপার্জন

করা উচিত এবং তোমার দেখাশোনা করা উচিত। ম্লান হাসি হেসে বাবা বললেন—তোদের কতটুকুই বা বয়স। কেমন করে উপার্জন করবি বল? তাছাড়া উপার্জন করতে গেলে যে পড়া ছাড়তে হবে!

বাবাকে সান্ত্বনা দান করে মারী বললে—তুমি বড্ড বেশী ভাবো বাবা। আমার বয়স না হয় একটু কম। কিন্তু দিদি তো বড় হয়েছে এবং লেখাপড়াও করেছে বেশ। তুমি দেখে নিও কোন অসুবিধা হবে না আমাদের।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন—আমার বড় ইচ্ছে ছিল, তোদের দু বোনকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠাবো। মানুষের মত মানুষ হবি তোরা। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না রে!

মারী উৎসাহের সংগে বললে—কেন হবে না বাবা? পড়া-শোনাও চালিয়ে রাখবো, আর উপার্জনও করবো। আমরা দুজনে যুক্তি করে ফেলেছি। কথা দিচ্ছি, তোমার সব আশাই পূর্ণ করবো।

বাবা বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তোদের পরিকল্পনাটা একবার খুলে বল দেখি!

মধুর হাসি হেসে মারী বললে—আমরা দুজনেই গৃহ শিক্ষকের কাজ জুটিয়ে নিয়েছি। পড়বো আর রোজগার করবো। হাতে কিছু পয়সা কড়ি জমলেই দিদি পারীতে চলে যাবে পড়াশোনা করতে। তারপর সেখানে সে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলেই আমি যাবো। আর তোমাকেও নিয়ে যাবো।

বাবা পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে চুপ করে গেলেন।

দু'বছর পরের ঘটনা। মারী ও ব্রনিয়া দুজনে হাত ধরাধরি করে যেন হাওয়ায় ভর করে ছুটে এলো বাবার কাছে। খুশিতে

একেবারে উপচে পড়ে মারী বাবাকে বললে—বাবা, খু-উ-ব বড় একটা সুখবর আছে।

বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন মেয়েদের দিকে। মারী যেন নাচতে নাচতে বললে—দিদির পারী যাওয়ার সব ব্যবস্থাই পাকা। মৃদু মৃদু হাসলেন বাবা, জিজ্ঞাসা করলেন—পড়ার খরচ চালানোর কী ব্যবস্থা করেছিস আগে বল দেখি!

এবার ব্রনিয়াই বাবার কথার উত্তর দিলে। বললে—আমরা দুজনে যতটুকু সঞ্চয় করেছি তাতে আপাততঃ কোন অসুবিধে হবে না। শুনেছি পারীতে পড়াশোনা করলে সহজে চাকরীও পাওয়া যায়।

মারী কথার মাঝখানেই বলে উঠল—আমিও এখানে এক বড়-লোকের ঘরে গৃহশিক্ষকের কাজ যোগাড় করে ফেলেছি। ওরা মাহিনা দেবে ভাল। তোমার ও আমার দুজনের বেশ খরচ চলবে তাতে। তাছাড়া কিছু বেশীও হবে। প্রয়োজন হলে দিদিকে কিছু কিছু পাঠাতেও পারবো।

বাবা খুব খুশি হলেন। দু-বোনের শুভ কামনা করে এক সময় বড় মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—ব্রনিয়া, মা আমার! একটু দাঁড়াতে পারলেই মারীকে ডেকে নিস যেন। ও বেচারা পড়াশোনার জন্য একেবারে পাগল।

ব্রনিয়া বললে—আমি জানি বাবা! ওর বিরাট প্রতিভাটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়—তার জন্যই আমার পারী যাওয়া এবং পড়াশোনা করা। তুমি দেখে নিও সুবিধা একটু করতে পারলেই ওকে ডেকে পাঠাবো।

মারীর এবার শুরু হলো বাড়ীতে পড়াশোনা। তার সবচেয়ে প্রিয় বিষয় গণিত ও পদার্থবিদ্যাকে নিয়েই শুরু করলে ভাবনা-চিন্তা। এদিকে আবার ঘরের কাজকর্ম করতে হয়, বাবার দেখা-

শোনা করতে হয় এবং গৃহশিক্ষকের কাজও করতে হয়। তবু অবসর পেলেই বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেয়।

ব্রনিয়া কিন্তু পারী গিয়ে প্রথমটায় বিশেষ সুবিধা করতে পারলে না। পড়াশোনা যদিও চালাতে পারলো তবু সহসা চাকরীর সন্ধান পেলে না সে। নিজের পায়ে দাঁড়াতেই কেটে গেল পাঁচ বছরের অধিক কাল। শেষে বিয়ে না করে যখন সুস্থিরতা অর্জন করলে তখনই ডেকে পাঠালে মারীকে।

মারী কিন্তু তখনও অপেক্ষা করে আছে এবং আগের মতই কাজ করছে। কিছু অর্থও সঞ্চয় করেছে এতদিনে। ব্রনিয়ার চিঠি পেয়ে সে খুশিই হলো। তথাপি একটা বিষাদের ছায়া পড়লো মুখে। বাবার বয়স বেড়েছে, তাঁর দেখাশোনা করবে কে ?

মারীর যাওয়ার কথা শুনে বাবা কিন্তু আনন্দিতই হলেন। মারীর সম্বন্ধে তাঁর আজও উচ্চ ধারণা আছে। এখনও বার বার উল্লেখ করেন, মারী পড়াশোনা করতে পারলে তাঁর মুখ উজ্জ্বলই করবে। তাঁর স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে বলে মারীকে বার বার উৎসাহিত করলেন পারী যাওয়ার জন্য। বললেন—তুই আমার জন্য আদৌ ভাবনা-চিন্তা করিসনে। যেমন করে হোক দিন চলে যাবে।

একদিকে প্রবল উচ্চাকাঙ্খা অপরদিকে বৃদ্ধ বাবা, মারী উভয় সংকটেই পড়লে। এতদিন বাহিরে যাওয়ার স্বপ্নই কেবল দেখছে সে। তার স্বপ্নে বাবার কথা বড় একটা মনে হয়নি। কিন্তু আজ যখন সেই বিশেষ মুহূর্তটি এসে গেল তখন বাস্তবের কঠিন স্পর্শে অন্তর হলো ক্ষতবিক্ষত। জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কাছে না থাকলে আমি কী নিয়ে দিন কাটাবো বাবা ?

বাবা হেসে বললেন—বাবা কী কারও চিরকাল বেঁচে থাকে রে ? আমার আদর্শ এবং আমার আশা তোমার ভেতরে সফল হলেই আমি অমরত্ব লাভ করবো। অতএব দ্বিধা করিসনে, ভাল কাজে দ্বিধা ভাল নয়।

বাবার তাড়নায় মারী যাওয়াই স্থির করলে। বাবার দেখাশোনার জন্য লোক নিয়োগ করলে। অর্থাভাবে বৃদ্ধ পিতার শেষের দিন-গুলো যাতে রুগ্ন, শীর্ণ ও পঙ্গু না হয়ে উঠে তারজন্য সঞ্চিত

অর্থও দিয়ে গেল বাবাকে। যাওয়ার সময় চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বললে—বাবা, তোমার বিচ্ছেদ আমার কাছে কত যে কষ্টকর—তা তোমাকে আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না। আমার মনের সবটাই পড়ে রইল তোমার কাছে। তবে কথা দিচ্ছি, পড়াশোনার শেষে একটা যেমন তেমন চাকরী জুটিয়ে নিতে পারলেই তোমাকে আমি নিয়ে যাবো। বাপ-বেটিতে থাকবো, খুব মজা হবে।

একটু থেমে পুনরায় বললে—তুমি সব সময় খবর দিও আমাকে। আর আমিও মাঝে মাঝে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে যাবো।

সেদিনের সেই স্নেহশীলা, স্বাধীনচেতা ও কর্তব্যপরায়ণা কিশোরীটিই বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠা মহিলা বিজ্ঞানী মাদাম কুরী। জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে। এত কষ্ট করে পড়াশোনা আর কেউ করেছেন বলে মনে হয় না। দিদির ডাকে পারীতে গিয়েও বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। পারিবারিক কারণে দিদির সাহায্যকে প্রত্যাখান করেছিলেন। ভাড়া করে থাকতেন—অতি দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানে থাকতেন তেমনটি একটি বাড়ীর সাততলায় একটি ছোট্ট কুঠুরীতে। আলো জ্বালাবার পয়সা ছিল না বলে, রাতে কলেজ লাইব্রেরী যতক্ষণ খোলা থাকতো ততক্ষণ বসে বসে পড়তেন।

ছিল না তাঁর শীতের পোষাক, এমন কি এক জোড়া জুতো কিনবার মতও সামর্থ ছিল না। শতছিন্ন জুতোয় তালি চাপিয়ে এনে পরতেন। রাতে যখন প্রচণ্ড শীত অনুভব করতেন তখন গায়ের উপর টেবিল চাপা দিতেন।

খাদ্যও ছিল অতি সামান্য। রুটি ও চা। ভাল খাদ্য একদিনের জন্যও জোটেনি পারীতে পাঠকালে। খাওয়ার খরচ বাঁচিয়ে গাড়ী ভাড়া যোগাড় করতেন এবং বাবার সঙ্গে দেখা করে আসতেন।

অমানুষিক পরিশ্রম ও খাদ্যাভাবের ফলে কিছুদিনের ভেতরেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। পাঠাগারে পড়তে পড়তে একদিন

অজ্ঞানও হয়ে পড়েছিলেন। সেই থেকে আর কোনদিনই তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি।

মারীর জীবনের সবচেয়ে বড় আশাটাই অপূর্ণ থেকে গেছে। যে চাকরীর জন্য উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ছুটে এসেছিলেন প্যারীতে, সেই চাকরীই তিনি লাভ করতে পারেননি দীর্ঘকাল। ফলে পিতাকে আনাতে পারেননি তিনি। এমন কি পিতাপুত্রীর শেষ দেখাটাও হয়নি।

বিবাহ হয়েছিল এক দরিদ্র অথচ জ্ঞান-পাগল অধ্যাপক পিয়েরে কুরীর সঙ্গে। প্রথম জীবনে দুজনে গবেষণা করতেন এক অস্বাস্থ্যকর ঘরে। গবেষণাগার করার মত এবং গবেষণাগারের জন্য ঘর ভাড়া করার মত কোন সামর্থ্যই ছিল না তাঁদের। প্রথমা কন্যা ইরেনের জন্মদানের পর তাঁর স্বাস্থ্য যখন ভেঙ্গে পড়ে তখন চিকিৎসক বায়ু পরিবর্তনের ব্যবস্থা দিলে তিনি হেসে বলেছিলেন "গরীবের এ বিলাসিতা শোভা পায় না।" সেই রুগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি স্বামীর পরিচর্যা করতেন, মেয়েদের যত্ন নিতেন এবং পড়াতেন, আর গবেষণাও করতেন। সে আবার এমন উন্নতমানের গবেষণা যে, তাতে লাভ করেছিলেন স্বামীর সঙ্গে নোবেল পুরস্কার।

নোবেল পুরস্কার লাভের পর তাঁর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সুনামও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যেন তাঁকে সব সময় তাড়া করেই চলতো। তাই পিতার মৃত্যুর কয়েক বছরে পরেই হারিয়েছিলেন স্বামীকে।

হয়ত দারিদ্র্য ও শোকই মাদাম কুরীকে মহীয়সীতে পরিণত করেছিল, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারীরূপে চিহ্নিত করেছিল এবং তাঁর মাতৃত্বের মধুর মহিমাকে বিকশিত করেছিল। ইনি এমন জননী, যিনি সম্মানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করেও শেষ বয়সে হতভাগ্য সৈনিকদের সেবার জন্য পিঠে ওষুধের বাক্স নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রগুলিতে পায়ে হেঁটে গমন করতেন। ইনি এমনই মহীয়সী—চরম দারিদ্র্যের সময় কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে নিজের আবিষ্কারকে পেটেণ্ট করেননি। মাদাম কুরী শুধু দুর্লভ এক বিজ্ঞানী নয়, দুর্লভ মাতৃত্বও।